কলকাতা বইমেলা ২০২০-তে সিএএ, এনপিআর, এনআরসি-র বিরুদ্ধে সংগঠনের স্বাক্ষর কর্মসূচী

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

রতনে রতন চেনে

জানুয়ারি, ২০২০ ■ ৪৮তম বর্ষ ■ নবম সংখ্যা ■ মূল্য দু'টাকা

সংগ্রামে-আন্দোলনে

মধ্যাঞ্চল

দার্জিলিং

নদীয়া

বাঁকুড়া

মালদা

এই সংক্রান্ত সংবাদ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্বাঞ্চল

মুখ্যমন্ত্রীকে প্রেরিত সর্বভারতীয় নেতৃত্বের পত্র

No. 11/2020/AISGEF/HQ Dated, 17th February, 2020

To
The Hon'ble Chief Minister,
Government of West Bengal,
Nabanna (14th Floor),
325, Sarat Chatterjee Road,
Shibpur, Howrah-711102

Respected Madam,

I, the undersigned, being the General Secretary of the All India State Government Employees' Federation, representing Government Employees of all States of this country, beseech your kind attention to the following matters for generous consideration and necessary intervention as you might deem fit:

I have come to know that 'ROPA 2019' for the Government employees of West Bengal has been introduced with effect from 01/01/2016 and actual effect from 01/01/2020. But unlike the conventional norms followed by the State Governments, no arrear pay for the period from 01/01/2016 to 31/12/2019 has been released.

It is equally surprising that, contrary to the doctrines of Pay Revision, the House Rent Allowance has been reduced from 15% to 12%. And, besides all these, the matter which has put all the employees in states of despair is the question of Dearness Allowance, which, even while our country's economy is facing stagflation, did not find its place in the revised package for the Government employees which contained the quantum of enhanced revised pay well below the desired level.

And to speak of the last but not the least is the matter concerning undemocratic and retaliatory transfer orders of some of the front runners of the State Coordination Committee, including its General secretary and Joint secretary.

I believe you would surely appreciate that, all these, put together, create a sense of deprivation as well as commotion. Your kind intervention can wipe these out from the minds of my colleagues in West Bengal.

Please consider this request and please do the needful.

Regards.

Yours faithfully,

A SREEKUMAR
General Secretary

১৯তম রাজ্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সমাপ্তি সভা

বিজয় শঙ্কর সিংহ

সংগঠনের ঊনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে গঠিত অভ্যর্থনা কমিটির সমাপ্তি সভা আজ ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ কর্মচারী ভবন, বর্ধমানে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। ১৭৫ জনের উপস্থিতিতে এই সভায় সভাপতিত্ব করেন অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি সুকুমার পাল। সভায় প্রাথমিক বক্তব্য উত্থাপন করেন অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক করালী চ্যাটার্জী। ঊনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ শঙ্কর ভট্টাচার্য্য। সবশেষে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ, অন্যতম সহ সম্পাদক অনুপ বিশ্বাস, দপ্তর সম্পাদক অভিজিৎ বসু, সভাপতি আশীষ ভট্টাচার্য্য, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অসিত ভট্টাচার্য্য, দেবলা মুখার্জী, শাশ্বতী মজুমদার। এছাড়াও অভ্যর্থনা কমিটির অধিকাংশ সদস্য, স্বেচ্ছাসেবক ও অন্যান্য কর্মী, নেতৃত্বগণ উপস্থিত ছিলেন।

অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক তাঁর বক্তব্যে সম্মেলনের দায়িত্ব পাওয়ার পর বর্তমান সঙ্কটময় পরিস্থিতির মধ্যে কীভাবে প্রস্তুতি গড়ে তোলেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখেন। তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যে গত ১৪ জুলাই, ২০১৯ দান মেলায়

সমাপ্তি সভায় উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর একাংশ

একদিনে মাত্র দু'ঘণ্টায় প্রায় ১০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ হওয়ায় জেলার কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। পাশাপাশি প্রায় চার হাজারের বেশি কর্মচারী ও পেনশনার্সদের কাছ থেকে দান মেলা সহ মোট প্রায় ২১ লক্ষ টাকা তহবিল সংগ্রহের উল্লেখ করেন। জেলার সমগ্র অংশের কর্মচারীদের এই কর্মকাণ্ডে যুক্ত করতে অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষে নানাবিধ কর্মসূচী ধাপে ধাপে কীভাবে পরিচালিত হয় তার উল্লেখ করেন। সম্মেলনের সাধ্যমতো প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যে অসুবিধাগুলি ছিল প্রতিনিধিরা যেভাবে মানিয়ে নিয়েছেন তার উল্লেখ করে প্রতিনিধিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

সবশেষে সাধারণ সম্পাদক অভ্যর্থনা কমিটির সদস্যদের ও স্বেচ্ছাসেবকদের অভিনন্দন জানাতে গিয়ে এই সময়ের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উল্লেখ করেন। কর্মচারীদের প্রতি রাজ্যের সরকারের ভূমিকার মোকাবিলায় এবং দেশের সরকারের জনবিরোধী নীতি ও মেরুকরণের রাজনীতির সমালোচনা করে রাজ্য সম্মেলন থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ৮ জানুয়ারি, ২০২০ ধর্মঘটকে সফল করার প্রচেষ্টা সহ কর্মচারীদের আর্থিক দাবিদাওয়া, সি এ এ, এন আর সি ও এন পি আর-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনে ভূমিকার উল্লেখ করেন। রাজ্য সম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির সাফল্যকে সংহত করে জেলায় কর্মচারী আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। সবশেষে অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি রাজ্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন। □

সম্পাদকীয়

বৃহত্তর লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু হোক

এই জানুয়ারি মাসেই সংশোধিত বেতনক্রমের ভিত্তিতে বর্ধিত বেতন হাতে পেয়েছেন রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা। রাজ্য কোষাগার থেকে বেতন পান, এমন বিভিন্ন অংশের কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ক্ষেত্রেও এই প্রক্রিয়া কার্যকরী হয়েছে বা হতে চলেছে। অবশ্য বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গঠিত পঞ্চম বেতন কমিশনের সুফলের সাথে, বর্তমান অর্থাৎ ষষ্ঠ বেতন কমিশনের যে সুফল কর্মচারী বন্ধুরা হাতে পেলেন—এই দুইয়ের তুলনামূলক আলোচনা করলে কিছুটা হতাশাই গ্রাস করতে বাধ্য। কারণ পঞ্চম বেতন কমিশনের মধ্য দিয়ে যে হারে সর্বস্তরের বেতনবৃদ্ধি ঘটেছিল, এবারে বৃদ্ধি ঘটেছে, কার্যত তার অর্ধেকেরও কম। কিন্তু শুধুমাত্র পরিমাণগত তারতম্যটাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ নয়। গত চার বছরেরও বেশী সময় ধরে বেতন কমিশনকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ঘটেছে, সম্ভবত তা-ই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হিসেবে আলোচনায় আসা উচিত।

একেবারে শুরু থেকেই যা লক্ষ্য করা গেছে, তা হল, বেতন কমিশন গঠন নিয়েই একটা চূড়ান্ত টালবাহানার শুরু হয়। কেন্দ্রীয় সরকার বেতন কমিশন গঠনের পর, অন্যান্য রাজ্য তা অনুসরণ করলেও, আমাদের রাজ্যের সরকার গড়িমসি শুরু করে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে একাধিক পত্র মারফৎ এবং ধারাবাহিক কর্মসূচীর মাধ্যমে রাজ্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার পর, বেতন কমিশন গঠন করা হয়। কিন্তু বেতন কমিশন গঠনের পর শুরুতে ছ'মাস সময় বেঁধে দেওয়া হলেও, ঐ ঘোষণা ছিল লোক দেখানো। কারণ ছ'মাসের মধ্যে কাজ শেষ করার জন্য যে উদ্যোগ প্রয়োজন ছিল, বেতন কমিশনের পক্ষ থেকে কখনোই সেই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এমনকি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও বেতন কমিশনের কাজের গতির ওপর কোনো নজরদারি ছিল বলে শোনা যায়নি। ফলে একদিকে বেতন কমিশনের কাজ এগোতে থাকে শম্বুক গতিতে। অপর দিকে কর্মচারীদের হা-হুতাশ বাড়তে থাকে। এতটাই সময় নিয়েছে বেতন কমিশন, এবং রাজ্য সরকারও বারবার মেয়াদ বৃদ্ধি করে যেভাবে তাতে মদত দিয়েছে, যে একসময় মনে হচ্ছিল, আদৌ বেতন কমিশন তার সুপারিশ প্রকাশ করবে তো? কিন্তু, যাই হোক, একসময় সেই আশঙ্কা কেটে যায়, যখন দীর্ঘ চার বছর পর (সম্ভবত সর্বকালীন রেকর্ড সময়ে) বেতন কমিশনের সুপারিশ সরকারের কাছে জমা পড়ে। তবে তা হঠাৎ করে বেতন কমিশনের শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছিল বলে নয়। দেরীতে হলেও সুপারিশ যে জমা পড়ল, তার প্রধান কারণ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে পরিচালিত ধারাবাহিক সংগ্রাম আন্দোলন। যার মধ্যে বেতন কমিশন দপ্তর (বিকাশ ভবন, লবণ হ্রদ) ও নবান্ন অভিযানের মতন জঙ্গী কর্মসূচীও ছিল। এমন কি, গ্রেপ্তারি ও প্রতিহিংসাপরায়ণ বদলির মতন রাজরোষের শিকার হয়েও, ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে যেতে হয়েছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির এই সক্রিয়তা ছিল বলেই, চার বছর পরে হলেও বেতন কমিশন তার সুপারিশ সরকারের কাছে জমা দিতে বাধ্য হয়েছে। তা না হলে সম্ভবত আরও কালক্ষেপ করা হত, এমনকি ঠান্ডা ঘরে পাঠিয়ে দেওয়ার আশঙ্কাও যে একেবারে ছিল না তা নয়।

সুপারিশ জমা পড়ার পরে, সরকার তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিল এটা ঠিক। কিন্তু সেখানেও অদ্ভুত একটা বিষয় লক্ষ্য করা গেল। বেতন কমিশনের সম্পূর্ণ সুপারিশে কী রয়েছে, তা গোপন থাকল। জনসমক্ষে এল না। অথচ বেতন কমিশনের পদ্ধতিতো এটা নয়। আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতাতো ভিন্ন। বেতন কমিশনের সুপারিশ নিয়ে সরকারী স্তরে কোনো লুকোছাপা আমরা এর আগে দেখিনি। বরং যেকোনো সংগঠন বা ব্যক্তি অর্থ দপ্তরে যোগাযোগ করলেই ঐ সুপারিশের কপি হাতে পেতে পারতেন। এবং তার ভিত্তিতে তাঁর বা তাঁদের মতামতও সরকারকে জানাতে পারতেন। গ্রহণ করা বা না করাটা সরকারের বিষয়, কিন্তু জানানোর সুযোগটা থাকত। কিন্তু এবারে তেমন কোনো সুযোগ পাওয়া গেল না। এমনকি সুপারিশের কপি চেয়ে চিঠি দেওয়ার পরেও অর্থদপ্তর থেকে কোনো উত্তর আসে নি। ফলে গোটা সুপারিশে কী রয়েছে, বা সমগ্র বিষয়গুলির ওপর কমিশনের চেয়ারম্যানের পর্যবেক্ষণ কী, বা তিনি যা বলেছেন তার কতটা সরকার গ্রহণ করেছে ইত্যাদি কোনো কিছুই জনপরিসরে এল না। এই গোপনীয়তার কারণ কী তাও বোঝা গেল না। শুধুমাত্র বেতন কাঠামো সংশোধনের যে সুপারিশ তার ভিত্তিতে রাজ্য সরকার 'রোপা ২০১৯' প্রকাশ করল। বেতন কমিশনের চেয়ারম্যান যাঁর নেতৃত্বে দীর্ঘ চার বছর ধরে কাজটা হল, তিনিও মঞ্চ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

রোপা ২০১৯ আশানুরূপ স্বাস্থ্যবান তো নয়ই এমন কি চরিত্রের দিক থেকেও ব্যতিক্রমী। কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের অনুকরণে ২০১৬-র ১ জানুয়ারি থেকে একে লাগু করা হল এবং তার ভিত্তিতে বর্ধিত বেতন কর্মচারীরা হাতে পাবেন ২০২০-র জানুয়ার মাস থেকে, এও বলা হল। কিন্তু মাঝের চারটে বছরের (২০১৬-র জানুয়ারি থেকে ২০১৯-র ডিসেম্বর) বকেয়া বেতন দেওয়া হবে না, স্পষ্টতই বলে দেওয়া হল। এমনটাতো অতীতে কখনও হয়নি। বামফ্রন্ট সরকারের সময় যে চারটি বেতন কমিশন হয়েছে, তার প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে 'বকেয়া বেতন' কর্মচারীরা পেয়েছেন। হয়ত সবটা হাতে পান নি। কিছুটা প্রভিডেন্ড ফান্ডে জমা পড়েছে। কিন্তু প্রভিডেন্ড ফান্ডে জমা পড়া মানেও তো কর্মচারীরাই পেলেন। এবারে কোনোটাই হলো না। ২০১৬-র জানুয়ারির বেতনকে সংশোধন করে মাঝের বছরগুলোতে সেই বর্ধিত বেতন, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট সহ দেওয়া হয়েছে ধরে নিয়ে একলাফে চলে আসা হল ২০২০-র জানুয়ারিতে। বেতন কমিশনের সুপারিশ প্রকাশে বিলম্ব হয়েছে বলেই, কর্মচারীরা মাঝের বছরগুলিতে অসংশোধিত বেতন নিতে বাধ্য হয়েছেন এবং ক্ষতি স্বীকার করেছেন, তাই তাঁদের সেই ক্ষতিপূরণের দায় সরকারেরই—এই সাধারণ ন্যায়ের ধারণাটিকেও বিসর্জন দেওয়া হল। তবে এখানেই শেষ নয়। 'রোপা ২০১৯' নামক রহস্যঘেরা ঝুলি থেকে সব বেড়াল এখনও বেরোয়নি, এক বেতন কমিশন তার পূর্বতন বেতন কমিশনের সুপারিশকে সঙ্কোচন করছে, এও এক বিরল অভিজ্ঞতা যা আমাদের হলো। বাড়ি ভাড়া ভাতার হার ১৫ শতাংশ থেকে নেমে ১২ শতাংশে! এর সাথেই এল সব থেকে বড় ধাক্কা—মহার্ঘভাতাই লোপাট হয়ে গেল সংশোধিত বেতন থেকে। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সংশোধিত বেতন চালু হওয়ার পর, তাঁরা যে কয়েক কিস্তি মহার্ঘভাতা পেয়েছেন (এখনও পর্যন্ত ১৭ শতাংশ), তার সবগুলিই যে আমাদের প্রাপ্য—এই প্রতিষ্ঠিত অধিকারটিকে (এমনকি মহামান্য আদালতও যাকে আইনসিদ্ধ এবং বলবৎযোগ্য অধিকার বলেছে) এক কলমের খোঁচায় নস্যাৎ করে দেওয়া হল। মহার্ঘভাতা নিয়ে আমাদের শীরঃপীড়া গত আটবছর ধরেই চলছে। কারণ মহার্ঘভাতা প্রাপ্তির হারে আমরা এই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের তুলনায় ক্রমশ পিছিয়েই পড়েছি। বারংবার বিভিন্নভাবে রাজ্য সরকারের কাছে দাবি উত্থাপন করার পরেও কোনো ইতিবাচক মনোভাব কখনও লক্ষ্য করা যায়নি। আর মহার্ঘভাতা নিয়ে এই টালবাহানার পর্ব চলেছে কখন? যখন দেশের অর্থনীতি মন্দায় আক্রান্ত। যখন পেট্রোপণ্য সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির জন্য দ্রুত বেতনের ক্ষয় হচ্ছে। যখন, সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষার খরচ বিপুল বৃদ্ধি পেয়েছে। যখন, কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে, একজন সরকারী কর্মচারীর আয়ের ওপর গোটা পরিবারটাই নির্ভরশীল—এমন পরিবারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। মহার্ঘভাতার প্রশ্নে রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত নেতিবাচক মনোভাবের কারণেই, গত আট-ন'বছর ধরে সংগঠন পরিচালিত আন্দোলন সংগ্রামের স্থায়ী এজেন্ডা ছিল—কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রদান করা।

ঠিক ঠিক কেন্দ্রীয় হারে না হলেও, ধারাবাহিক আন্দোলন ও পারস্যুয়েশনের চাপেই, বছরে একবার রাজ্য সরকারের অনিচ্ছুক হাত থেকে মহার্ঘভাতা বেরিয়ে ছিল, যা কর্মচারীদের মনে 'নেই মামার থেকে কানা মামা ভাল' গোছের অনুভূতি তৈরী করেছিল। কিন্তু 'মহার্ঘভাতা' নামক মহার্ঘ বস্তুটির সাথে বাৎসরিক মিলনপর্বেরও পরিসমাপ্তি ঘটল সংশোধিত বেতন চালু হওয়ার সাথে সাথেই। মহার্ঘভাতা বিহীন বেতন সংশোধনের এক অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করল আমাদের রাজ্যের সরকার। যা দেখে ও শুনে হতবাক অন্যান্য রাজ্যের কর্মচারীরাও।

কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গটি হল, বেতন সংশোধনের স্থিরীকৃত মাপকাঠিগুলিকে এলোমেলো করে দেওয়া এবং মহার্ঘভাতার মতন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকারকে সরকারের তরফ থেকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়ার পরেও, যে ধরনের ক্ষোভজনিত প্রতিক্রিয়া কর্মচারী বন্ধুদের মধ্যে থেকে আসা উচিত ছিল তা কিন্তু আসে নি। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ সভার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। বহু কর্মচারী ঐ সভাগুলিতে যোগও দিয়েছিলেন। কিন্তু যোগ দেন নি, যোগ দেওয়ার তাগিদ ভেতর থেকে অনুভব করেন নি, এমন সংখ্যাটাও নেহাত কম নয়। হয়ত বা বেশীই। যাঁরা প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করা থেকে বিরত থাকলেন, তাঁদের মনের মধ্যে যে ক্ষোভের বারুদ জমে নেই তা নয়। রয়েছে। কিন্তু তাঁরা অকিঞ্চিৎকর বেতন বৃদ্ধির মলম দিয়ে, ক্ষোভের ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা করছেন। হয়ত বা মনে করছেন, অল্পেই খুশি থাকি। প্রতিবাদ করতে গিয়ে যদি রাজরোষের শিকার হতে হয়?

এই ধরনের গা বাঁচিয়ে চলার আত্মরক্ষামূলক মনোভাব যে শুধুমাত্র বেতন কমিশনকে ঘিরেই প্রকাশ্যে এল তা নয়। 'পরিবর্তন' পর্বের (২০১১) গোড়া থেকেই অনেকেই এই কৌশলী অবস্থান গ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ দাবি ও অধিকারগুলি হস্তচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও, নিজেকে বাঁচাতে চাইছেন। এই মনোভাবের প্রতিফলন ঘটে ব্যক্তি কর্মচারীর শরীরী ভাষায়। এই মনোভাবের যত বেশী প্রসার ঘটে প্রশাসনের অভ্যন্তরে, তত বেশী শাসকের 'অ্যাডভান্টেজ'। সমস্ত ধরনের অধিকারকে চূর্ণ করার স্টিম রোলার চালানোর পথটা সহজ হয়। তাই আমরা লক্ষ করি বিধানসভায় বাজেট পেশের সময় যখন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী রাজ্যের অর্থনীতির বিরল অগ্রগতির (যখন গোটা দেশের অর্থনীতি মন্দায় আক্রান্ত!) ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিমূলক 'গল্প' শোনাচ্ছেন, তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অবলীলায় সাংবাদিকদের সামনে বলছেন, 'হাতে টাকা নেই, টাকা এলে মহার্ঘভাতা দেবার কথা ভাবব।' একই সাথে মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নির্দ্বিধায় বলতে পারছেন, তার জন্য দায়ী আমরাই। দায়ী আমাদের আপাত নির্লিপ্ততা।

এক্ষেত্রে গোটা দেশের পরিস্থিতি থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি। কাশ্মীর প্রসঙ্গে সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল বা বাবরি মসজিদের জমিকে কেন্দ্র করে সুপ্রিম কোর্টের বিতর্কিত রায়ের পরেও, সারা দেশজুড়ে তেমন স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ না হওয়ার ফলে, কেন্দ্রের শাসকদল অতি উৎসাহী হয়ে দ্রুত সি এ এ-এন পি আর-এন আর সি-র হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডা কার্যকরী করতে বেরিয়েছিল। কিন্তু এবার জন চেতনার ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি জেগে উঠেছে। কাঁপিয়ে দিয়েছে শাসকের স্বৈরতান্ত্রিক একগুঁয়েমির ভিত। বাধ্য করছে শাসককে পিছু হটতে। তাহলে আমরা কি পারি না আমাদের চেতনার ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরিটাকে জাগিয়ে তুলতে? যেমন দেশের সব অংশের মানুষ শাসকের চোখে চোখ রেখে বলছেন, সি এ এ-এন পি আর-এন আর সি বাতিল কর। যেমন শাসকের রক্তচক্ষু, অপবাদ (পাকিস্তানপন্থী) ও পুলিশের উদ্যত লাঠিকে উপেক্ষা করেও রাতের পর রাত জাগছে রাস্তায়। ঠিক তেমনই, আমরা কি পারি না, আপাত নির্লিপ্ততা ও আত্মরক্ষার খোলস থেকে বেরিয়ে এসে শাসকের চোখে চোখ রাখতে? সহস্র কণ্ঠে একসাথে বলে উঠতে কি পারি না—আমরা রাজতন্ত্রে নেই, গণতন্ত্রে রয়েছি। আমরা কোনো রাজাধিরাজের খাসতালুকের প্রজা নই। আমরা এদেশের নাগরিক। যাদের সাথে জনগণের ভোটেই নির্বাচিত একটি সরকার কিছু শর্ত ও অধিকারের ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এখন সেই শর্ত ও অধিকারগুলিকে যদি গুরুত্বহীন করে ফেলার চেষ্টা হয়, তাহলে তার পরেও আমরা ভাবলেশহীন নির্লিপ্ততায় চুপ করে থাকব? আমরা কি পারি না শাহিনবাগ, জে এন ইউ, জামিয়া মিলিয়ার উত্তাপটাকে আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে? আমরা কি পারি না নিশ্চেষ্টতার লজ্জাজনক অবস্থান থেকে নিজেদের বের করে আনতে? বহু লড়াই-এর রক্ত বইছে আমাদের শিরা ও ধমনীতেতে। তাই স্ব-আরোপিত গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসে, আসুন শুরু করি বৃহত্তর লড়াইয়ের প্রস্তুতি। □

২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

শোক সংবাদ

অনন্ত নায়ক

বাঁকুড়া জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম সহ সম্পাদক, ডব্লু বি এম ও এ সমিতির জেলা সম্পাদক কমরেড অনন্ত নায়ক গত ৩ ফেব্রুয়ারি '২০ এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৪ বৎসর। তাঁর অকাল প্রয়াণে সরকারী মহলে নেমে আসে বিস্ময়ের ছায়া। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত হন। কিন্তু ডাক্তারদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে কমরেড নায়ক হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঐ দিন রাত ১টায় কমরেড নায়কের মরদেহ জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটি দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে মরদেহে মাল্যদান করেন জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক অতনু মজুমদার, জেলার কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা প্রণব মুখার্জী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এরপর মরদেহ ডব্লু বি এম ও এ-র জেলা দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। অসংখ্য নেতা-কর্মী ও অনুরাগীদের উপস্থিতিতে লক্ষ্যাতোড়া শ্মশানঘাটে কমরেড অনন্ত নায়কের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

কমরেড নায়ক ১৯৭৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তালডাংরা থানার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষত্রের পর বাঁকুড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ন হন। কমরেড নায়কের পিতা শ্রী রবীন্দ্রনাথ নায়ক সাবড়াকোন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন। সেই বিদ্যালয় থেকেই বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ন হয়ে কমরেড নায়ক বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজে রসায়ন শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে ভর্তি হন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে স্নাতক স্তর তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেন নি ঐ কলেজে। কিন্তু তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা এতটাই ছিল যে পুনরায় উদ্যোগী হয়ে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে, বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স-এ ২০০০ সালে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ২০০২ সালে ডিগ্রি অর্জন করেন।

এরপর ঐ বছরেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি প্রজেক্টে চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসাবে যুক্ত হন এবং ৯/৭/২০০৩ পর্যন্ত কাজ করেন। পরবর্তীকালে কোতুলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ১০/৭/২০০৩ সাল থেকে ১৬/৫/২০০৭ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক কর্মী থাকার পর মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ল্যাব) পদে স্থায়ী কর্মী হিসাবে ঐ হাসপাতালেই ১৭/৫/২০০৭ সালে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে ১৮/১২/২০০৭-এ জীড়বাঁধ বি পি এইচ সি-তে বদলি হন। অমৃত্যু তিনি ওখানেই কর্মরত ছিলেন। চুক্তিভিত্তিক কাজে যোগাদানের পরই তিনি ডব্লু বি এম ও এ-র সদস্য হন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক চেতনা, কর্মীসত্তা, সাংগঠনিক লক্ষ্যে নিষ্ঠা, মধুর ব্যবহার ইত্যাদি কারণে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেন। সমাজ বদলের স্বপ্ন বুকে নিয়েই তিনি ধীরে ধীরে সংগঠনের দক্ষ কর্মী ও পরবর্তীকালে নেতৃত্বের স্তরে পৌঁছান। ২০০৭ সালে ডব্লু বি এম ও এ সমিতির জেলা যুগ্ম সম্পাদক এবং ২০১৯-এর শেষে অনুষ্ঠিত সমিতির জেলা সম্মেলনে তিনি সমিতির জেলা সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। প্রায় একই সময়ে জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহ-সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। অত্যন্ত সম্ভাবনাময়, প্রাণবন্ত, সংস্কৃতি মনস্ক, প্রতিনিয়ত আত্ম অনুশীলনে বিশ্বাসী এই কমরেডের এই আকস্মিক অকাল প্রয়াণে সমগ্র কর্মচারী আন্দোলনে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর স্ত্রী, দুই কন্যা, পিতা-মাতা, ভাই ও এক বোন বর্তমান। বিগত ১৯ ফেব্রুয়ারি জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও সমিতির যৌথ উদ্যোগে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব কমরেড অনন্ত নায়ক -এর স্মৃতিচারণা করেন। □

পরমেশ দে

পশ্চিমবঙ্গ সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক কমরেড পরমেশ চন্দ্র দে গত ২৭ জানুয়ারি ২০২০ বিকাল ৫টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বারাসাত নারায়ণী হাসপাতালে প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। কমরেড পরমেশ চন্দ্র দে ১৯৫৭ সালের ২৬ আগস্ট অবিভক্ত ২৪ পরগনা বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিশরপাড়া নবজীবন কলোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরবর্তীকালে নবজীবন বিদ্যামন্দির থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করেন এবং দমদম মতিঝিল কলেজ থেকে প্রি-ইউনিভার্সিটি পাশ করেন। ১৯৭৬ সালে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাটে সেটেলমেন্ট দপ্তরে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার, রাজারহাটে দীর্ঘ কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। কর্মচারী জীবনেও তিনি অত্যন্ত সৎ, দক্ষ ও ন্যায়নিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। কর্মরত জীবনের প্রথম থেকেই পশ্চিমবঙ্গ সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতির সদস্য হন ও সক্রিয় সাংগঠনিক জীবনে প্রবেশ করেন। কমরেড পরমেশ চন্দ্র দে তাঁর সাংগঠনিক জীবনে একজন মিষ্টভাষী, সদালাপী, নীতিনিষ্ঠ ও আদর্শবান কর্মী ছিলেন। অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলায় সহ-সম্পাদকের পদ দক্ষতার সাথে প্রতিপালন করেছিলেন। জেলা ভাগের পর উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সদর দপ্তরে যোগদান করেন। ১৯৯৬ সালে বাঁকুড়া জেলায় অনুষ্ঠিত ৩৮-৩৯তম রাজ্য সম্মেলনে সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের দাশুমতি হলে অনুষ্ঠিত ৪০-৪১তম রাজ্য সম্মেলনে দ্বিতীয়বারের জন্য সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই সময়কালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগে বেশ কিছু কর্মচারী স্বার্থ সম্বলিত সরকারী আদেশনামা প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। বিশেষত বিভাগে বদলি নীতি রূপায়ণে তাঁর ভূমিকা আজও প্রাসঙ্গিক। সমিতির পত্রিকা 'ভূমিজ'র প্রথম সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব প্রতিপালন করেছিলেন। পাশাপাশি ২০১০-২০১৬ তিনি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ারের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। ঐ সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বেশ কিছু প্রবন্ধ ও নিবন্ধ লেখেন।

১৯৮৪ সালের জুলাই মাসে শ্রীমতী মঞ্জু দে'র সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তাদের একমাত্র পুত্র শ্রীমান দীপায়ন দে। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি কর্মচারী ভবনের অরবিন্দর সভাকক্ষে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি আশিস ভট্টাচার্য। □

রাজ্য বাজেট ২০২০-২১

তথ্যহীন, ভিত্তিহীন এবং বিভ্রান্তি মূলক

মানস কুমার বড়ুয়া

বিগত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ রাজ্য বিধানসভায় রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র ২০২০-২১ আর্থিক বছরের বাজেট পেশ করেছেন। এই বাজেটে যে উন্নয়ন ও সাফল্যের খতিয়ান পেশ করা হয়েছে তার সাথে বাস্তবের কোনো মিল নেই। সারা দেশ যেখানে অর্থনৈতিক মানোন্নয়ন থেকে কর্মসংস্থান ক্ষেত্র সবেতেই পিছিয়ে পড়ছে, সেখানে রাজ্য বাজেটে দাবি করা হয়েছে এইসব ক্ষেত্রে নাকি অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটছে রাজ্যে। সামান্য কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হলো।

রাজ্য বাজেটের প্রথম পাতায় লেখা হয়েছে যে, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে বাংলার জি ডি পি বৃদ্ধির হার হয়েছে ১০.৪ শতাংশ, যা নাকি এই সময়ে সমস্ত দেশের জি ডি পি বৃদ্ধির হারের দ্বিগুণ। এবার প্রকৃত তথ্য দেখা যাক। প্রথমত রাজ্যের মোট উৎপাদনকে সাধারণত জি ডি পি নয় এস ডি পি (স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট) বলা হয়। বর্তমান অর্থবর্ষে এই এস ডি পি-র বৃদ্ধির হার এখনও পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে জানা যায় নি। এই যে তথ্যটি আর্থিকভাবে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান সংস্থাকে জানানো হয়েছে, তা একটি অনুমান মাত্র। সাধারণত এর এক বছর পরে কেন্দ্রীয় সংস্থা তা যাচাই করে চূড়ান্ত করে। রাজ্যের পাঠানো কৃষি, শিল্প, পরিষেবা ক্ষেত্রের এই সংক্রান্ত তথ্য শুধু অনুমানের ভিত্তিতেই এখনও পর্যন্ত আছে।

অর্থনৈতিক মন্দাজনিত কারণে গোটা দেশে যখন শিল্পে বৃদ্ধির হার ক্রমশ তলানিতে ঠেকেছে (বাজেটে উল্লেখিত ৩.৬ শতাংশ), তখন বাংলায় নাকি শিল্পে বৃদ্ধির হার ৩.১ শতাংশ। এই তথ্যের ভিত্তিগত কোনো হদিস বাজেটে নেই। বর্তমান সরকারের জমানায় নতুন কিছু হওয়া তো দূরের কথা, ছোট-মাঝারি শিল্প একের পর এক রুগ্ন বা বন্ধ হয়েছে। শিল্পে বিনিয়োগের যে পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে তারও কোনো ভিত্তি নেই। এক্ষেত্রে সাফল্যের ঢাক পিটিয়ে বলা হয়েছে। "৫টি বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট-এর অভূতপূর্ব সাফল্য বাংলাকে

গর্বিত করেছে। এই কমিটিগুলিতে যে বিশাল বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে তার মধ্যে বড় শিল্পের ক্ষেত্রে ৪.৪৫ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে।" কিন্তু আর্থিক সমীক্ষাতে কোন্ কোন্ শিল্প এই সময়কালে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এগুলির ভৌগোলিক অবস্থান কোথায় সেই তথ্য একেবারেই নেই।

বাজেট বিবৃতির তিনের পাতায় একটি চমকপদ ঘোষণা রয়েছে। বলা হয়েছে "বড় অঙ্কের টাকার দেনা শোধ করেও, কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতা সত্ত্বেও, আমরা মানুষের সাথে থেকে, মানুষের পাশে থেকে, অনেক সামাজিক কর্মসূচি নিয়েছি। এর সুফলে সারা ভারতবর্ষে যখন বেকারত্বের হার গত ৪৫ বছরে সর্বাধিক, তখন বাংলায় বেকারত্ব ৪০ শতাংশ কমেছে।" না, এর চেয়েও হাস্যকর বক্তব্য আছে বাজেটের শেষ পাতায়। সেখানে উল্লেখ আছে, "এখনও পর্যন্ত আমরা রাজ্যে ৯ লক্ষ ১১ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পেরেছি।"

৯ লক্ষ ১১ হাজার কর্মসংস্থান গত এক বছরে ??? কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে, কোথায় তার কোনো উল্লেখ্য নেই। এছাড়া সারা দেশে যখন বেকারের সংখ্যা হু হু করে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন কোন যাদুবলে এরাজ্যে কমছে—তার কোনো উত্তর বাজেটে নেই। বাস্তব হচ্ছে এই রাজ্যে কাজ নেই বলেই লক্ষ লক্ষ বেকার যুবককে কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যে ছুটতে হচ্ছে। সেখানে অনেকের মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে। এই রাজ্যে যেটুকু সামান্য নিয়োগ হয়েছে, সেখানেও পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে বারে বারে। দেখা গেছে শাসক দলের পরিবারের এক বা একাধিক সদস্যের নিয়োগ, লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে চাকরি দেওয়ার মতো কুৎসিত প্রক্রিয়া আজ প্রায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে।

বাজেটে কৃষির সাফল্য নিয়েও অনেক বাগাড়ম্বর করা হয়েছে। তৃণমূল সরকার আসার পর অন্যান্য ক্ষেত্রের মতন এই ক্ষেত্রটিও চূড়ান্ত অবহেলিত। ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে ভয়াবহ সংকটে পড়েছেন কৃষকরা। এছাড়া কেন্দ্রের নীতির কারণে কৃষি উৎপাদন, সার, বীজ, সেচের সরঞ্জামের দাম যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তার মোকাবিলায় কৃষকের স্বার্থে রাজ্য সরকার কোনো ভূমিকাই নেয়নি। এখন পর্যন্ত রাজ্যে আত্মঘাতী কৃষকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২২৫-এর কাছাকাছি। বাজেট পেশের পর মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, রাজ্যের কৃষকরা নাকি ভালো আছেন এবং কৃষকের আয় তিনগুণ বাড়িয়েছে রাজ্য সরকার। কিন্তু প্রকৃত বাস্তব হলো, কৃষি ও কৃষি বিপণনে মমতা ব্যানার্জির সরকার বাজেট বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে। গত বছর বাজেটে কৃষি বরাদ্দ ছিল ৬০৮৬ কোটি টাকা। এবার সেখানে বরাদ্দ হয়েছে ৫৮৬০.৫৭ কোটি টাকা। আর গত বছর কৃষি বিপণন ক্ষেত্রে বরাদ্দ হয়েছিল ৩৫৯ কোটি টাকা। এবার তা কমে হয়েছে ৩৫০ কোটি টাকা। এছাড়াও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগ, মৎস্য বিভাগ, সেচ ও জলপথ পরিবহন বিভাগে বরাদ্দ গতবারের তুলনায় কমিয়েছে রাজ্য সরকার।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যখন আর এস এস-এর নির্দেশে প্রতিটি ক্ষেত্রে তীব্র ধর্মীয় মেরুকরণের পথ নিয়েছে, সেই পরিস্থিতিতে এরাজ্যের সরকারও ধর্ম ও সম্প্রদায়কে ভিত্তি করে বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে চলেছে। এ নিয়ে বিশেষজ্ঞমহলে বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছে। বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী বলেছেন, "আগামী ২ বছরে রাজ্যে আরও তিনটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে—ঝাড়গ্রামে বীরসা মুণ্ডা বিশ্ববিদ্যালয়, তফসিলি জাতি অধ্যুষিত এলাকায়

▶▶ ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি'র ১৯তম সম্মেলন উপলক্ষে গঠিত অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদকের সাক্ষাৎকার

২৬ ডিসেম্বর '১৯ অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক কমরেড করালী চ্যাটার্জীর সঙ্গে মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ারের প্রতিনিধিরা সাক্ষাৎ করেন। এই মহতী সম্মেলনের সমগ্র ব্যবস্থাপনা, তহবিল সংগ্রহ এবং বিশাল কর্মীবাহিনীর কাজকর্ম প্রসঙ্গে অভ্যর্থনা কমিটি যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সেই বিষয়ে তিনি যে আলোকপাত করেন সেটি নিম্নরূপ।

সংগ্রামী হাতিয়ার ঃ আপনারা যখন জানতে পারলেন যে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি'র ১৯তম সম্মেলন এই জেলায় অনুষ্ঠিত হবে তখন আপনাদের অনুভূতি কীরকম ছিল?

করালী চ্যাটার্জী ঃ ১৯তম সম্মেলন এই জেলায় হচ্ছে জেনে আমরা,জেলার কর্মচারীরা খুবই আনন্দিত হই। রাজ্য কাউন্সিলের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা প্রস্তুতির প্রাথমিক কাজ অর্থাৎ সম্মেলন উপলক্ষে অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের কাজ শুরু করি। ১৪ জুলাই '১৯ অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের দিন ধার্য হয় এবং ঐ দিন বিপুল উদ্যমে তা গঠিত হয়। আর্থিক দায় নিয়ে মনে একটা শঙ্কা ছিল, কিন্তু অচিরেই তা দূর হয়। প্রায় ৪০০ জন বর্তমান ও প্রাক্তন কর্মী-সংগঠক নেতৃত্বকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম, কিন্তু ঐদিন প্রায় ৭০০ জন উপস্থিত হন।

সংগ্রামী হাতিয়ার ঃ আর্থিক দায় নিয়ে যে শঙ্কা ছিল, তা কীভাবে দূর হল?

করালী চ্যাটার্জী ঃ সংগঠনের জন্য কর্মচারীদের মনে যে কতটা ভালোবাসা রয়েছে তা আমাদের বোধের মধ্যে ছিল না। ১৪ জুলাই অর্থাৎ অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের দিন আমরা দান মেলা আহ্বান করি। মাত্র ২ ঘণ্টায় দশ লক্ষাধিক টাকা সংগৃহীত হয়। অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী, সি আই টি ইউ, ছাত্র, যুব সহ প্রচুর মানুষ উপস্থিত ছিলেন এবং দান মেলায় অংশগ্রহণ করেছেন। এমনকি পরিবারের সদস্যরাও অংশগ্রহণ করেন। মোট তহবিল ২০ লক্ষ টাকার বেশী সংগৃহীত হয়েছে। জেলার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়ভাবে ধার্য করা তহবিলের দ্বিগুণ দিয়েছেন কর্মচারীরা। মহকুমা স্তর পর্যন্ত নেতৃত্ব-কর্মীরা এক দিনের বেতনের সমান টাকা দিয়েছেন। এসব আমাদের মনের যাবতীয় শঙ্কাকে দূর করেছে এবং সাহসে ভর করে সম্মেলনের কাজে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছে।

সংগ্রামী হাতিয়ার ঃ অভ্যর্থনা কমিটি গঠনে কোন কোন বিষয়ে জোর দিয়েছেন এবং মোট কত জনের কমিটি গঠিত হয়েছিল?

করালী চ্যাটার্জী ঃ সমগ্র কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ও কর্মকুশলতার একটা মেলবন্ধন জরুরী ছিল। আমরা সেটাই করার চেষ্টা করেছি। জেলার প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ অনুপ সাহাকে সভাপতি করে মোট ১৯০ জনের অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। উপদেষ্টা হিসেবে বয়োজ্যেষ্ঠদের আমরা রেখেছি এবং তাঁদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছি।

সংগ্রামী হাতিয়ার ঃ সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারের কাজ কীভাবে করেন?

করালী চ্যাটার্জী ঃ অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের শুরু থেকেই রাজ্য জুড়ে প্রচার অভিযান শুরু হয়েছে। রক্তদান কর্মসূচী, সাংস্কৃতিক কর্মসূচী ইত্যাদি ট্র্যাডিশনাল পদ্ধতির বাইরে গিয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী ইত্যাদি করা হয়েছে। মাননীয় জেলা শাসক মহাশয়কে এ বিষয়ে আমরা চিঠি দিয়েছিলাম, তিনি আমাদের সহায়তা করেছেন। এছাড়াও প্রতিটি ব্লকে ট্যাবলো সহ প্রচার করা হয়েছে।

সংগ্রামী হাতিয়ার ঃ কর্মচারী পরিবারের মানুষজন কেমন ভাবে এই কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়েছেন?

করালী চ্যাটার্জী ঃ তহবিলে অংশগ্রহণ সহ বিভিন্নভাবে পরিবারের লোকজন যুক্ত হয়েছেন।

সংগ্রামী হাতিয়ার ঃ প্রচারের কাজে কী কী করা হয়েছে?

করালী চ্যাটার্জী ঃ গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষ থেকে প্রচার কর্মসূচীতে সাহায্য পাওয়া গেছে। ৬টি সুদৃশ্য ট্যাবলোর মাধ্যমে ২ দিন সারা জেলায় প্রায় ১৫০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার মধ্য দিয়ে আমাদের বক্তব্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছনো হয়েছে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সমস্যার বিষয়ের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে।

সংগ্রামী হাতিয়ার ঃ সাধারণ মানুষের থেকে কীরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে?

করালী চ্যাটার্জী ঃ মানুষ বিপুলভাবে উৎসাহিত হয়েছেন। তাঁরা আরও আমাদের সাহচর্য চাইছেন। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরে একটা দমবন্ধ করা সন্ত্রাসময় পরিবেশ থেকে মানুষ মুক্তি চাইছেন। যেকোনো প্রগতিশীল কর্মসূচী গ্রহণে সরকারের অনুমতি পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। সাধারণ মানুষের সাথে ছোট ব্যবসায়ীগণ আমাদের প্রচারে অংশগ্রহণ করেছেন।

সংগ্রামী হাতিয়ার ঃ এই সম্মেলন পরিচালনায় কতজন স্বেচ্ছাসেবক রয়েছেন?

করালী চ্যাটার্জী ঃ ৫০ জন মহিলা সহ ১৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই সম্মেলনকে সফল করেছেন।

সংগ্রামী হাতিয়ার ঃ আবাসন সহ সম্মেলন স্থল কতগুলি এবং কীভাবে পাওয়া গেছে?

করালী চ্যাটার্জী ঃ ৪টি স্থানে প্রতিনিধিদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটা ক্যাম্পাসের মধ্যেই সকলকে রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কিন্তু রাজনৈতিক চাপে স্কুল ইত্যাদি পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়েছে। ৩টি বাড়ি ভাড়া নিতে হয়েছে। জেলার কর্মচারী ভবন এবং সম্মেলন স্থল সংস্কৃতি লোক মঞ্চেও কিছু প্রতিনিধির থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

সংগ্রামী হাতিয়ার ঃ প্রকাশ্য সমাবেশের ক্ষেত্রে কী কী পরিকল্পনা করা হয়েছে?

করালী চ্যাটার্জী ঃ এখান থেকে সামান্য দূরত্বে টাউন হলের ময়দানে প্রকাশ্য অধিবেশন হবে। পেনশনার্স সহ সাধারণ মানুষ আসবেন। মহম্মদ সেলিমের এই জেলায়

▶▶ ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

কেন্দ্রীয় বাজেট ঃ দেশ বিক্রির পাঁচালী

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

নরেন্দ্র মোদী সরকারের দ্বিতীয় দফার শাসন পর্বে প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট গত ১ ফেব্রুয়ারি সংসদে পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। ইতোমধ্যেই এই বাজেটে উত্থাপিত বেশকিছু প্রসঙ্গ নিয়ে জাতীয় রাজনীতির স্তরে বেশ শোরগোল পড়ে গেছে। মূল প্রশ্ন যেটি উঠেছে, তা হল জাতীয় অর্থনীতির বর্তমান পর্বের প্রধান সঙ্কটগুলির সমাধানে এই বাজেট কতটা সাহায্য করবে, না কি বর্তমান সঙ্কটে এই বাজেট প্রস্তাব নতুন মাত্রা যুক্ত করবে? নিয়ম অনুযায়ী কেন্দ্রীয় বাজেট পেশের ঠিক আগের দিন মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কৃষ্ণমূর্তি সুব্রাহ্মনিয়াম ২০১৯-২০ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা সংসদে পেশ করেছেন। এই সমীক্ষায় জাতীয় অর্থনীতির বর্তমান চালচিত্রের সরকারী ভাষ্য জানা যায়। অবশ্য দ্বিতীয় নরেন্দ্র মোদী সরকার, অর্থনীতি সম্পর্কে সরকারী তথ্য বা পরিসংখ্যান পেশ করার ক্ষেত্রে কারচুপি করেছে বা সবসময় প্রকাশ করতে চাইছে না। যেমন, এন এস ও-র বেকারীর হার সম্পর্কে পরিসংখ্যান সরকারী ভাবে প্রথমে প্রকাশিত হয়নি। প্রচার মাধ্যমের একাংশের পক্ষ থেকে তা প্রকাশ করে দেবার পর কিছুটা বাধ্য হয়েই এই রিপোর্ট সরকারী ভাবে প্রকাশ করা হয়। মিডিয়ায় যে সর্বশেষ এন এস এস ও সমীক্ষা ফাঁস হয়ে গেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে গ্রামীণ ভোগের জন্য ব্যয় অত্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু সরকার তার নির্লজ্জ ব্যর্থতা আড়াল করতে এই প্রতিবেদনটি আনুষ্ঠানিক ভাবে জনসমক্ষে প্রকাশ করতে অনুমতি দেয়নি। কিন্তু সঙ্কটকে চেপে রেখে তো সঙ্কটের জ্বালা থেকে জনগণকে রক্ষা করা যায় না। এই প্রেক্ষিতেই দেশের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতির প্রধান প্রধান কিছু দিক ও তা মোচনে কেন্দ্রীয় বাজেটের ভূমিকা ও ফলাফল ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচনা করা প্রয়োজন।

আর্থিক পরিস্থিতি

প্রাক বাজেট অর্থনৈতিক সমীক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল পূর্বে পেশ করা ভবিষ্যৎ জি ডি পি সম্পর্কে একটি ঘোষণা। এখানে বলা হয়েছিল যে, আগামী ৫ বছরে দেশের জি ডি পি বৃদ্ধি পেয়ে ৫ লক্ষ কোটি ডলারে উন্নীত হবে। যে সময় এই ঘোষণা করা হয়েছিল সে সময় জি ডি পি-র পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি ডলার। সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, ২০১১-১২ সাল থেকে ২০১৬-১৭ সালের মধ্যেই জি ডি পি বৃদ্ধির হার ছিল ৭ শতাংশ। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে এ পরিসংখ্যান কারচুপিপূর্ণ। প্রাক্তন মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অরবিন্দ সুব্রাহ্মনিয়াম যে তথ্য-পরিসংখ্যান নির্মাণ করেছিলেন তাতে দেখা যাচ্ছে প্রকৃত বৃদ্ধির হার সাড়ে চার শতাংশের কম। অর্থাৎ আড়াই শতাংশ বিন্দু (পার্সেন্টেজ পয়েন্ট) কম।

আর্থিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, 'মেক ইন ইন্ডিয়া' স্লোগানের মধ্যে দিয়ে হয় তবে তা ভারতের গ্রামাঞ্চলে ৯.৮ শতাংশের বেশী কমেছে। শহরাঞ্চলে এটি প্রায় একই থেকে গেছে। জনগণের ক্রমবর্ধমান অনাহার এবং বেঁচে থাকার সমস্ত মৌলিক প্রয়োজনীয়তা থেকে বঞ্চনা মোদী শাসনের আচ্ছে দিনের এক অতি নির্মম বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। ঠিক এই চিত্রটিই বিশ্বক্ষুধাসূচকে স্পষ্ট হয়েছে। এখানে ভারতের র‍্যাঙ্কিং এমনকি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের থেকেও নীচে নেমে ১০২তম হয়েছে।

অর্থনৈতিক মন্দা দারিদ্র্যকে আরও গভীরতর করেছে। এক সমীক্ষা প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১১-১২সালের তুলনায় ২০১৭-১৮ সালের তুলনায় গ্রামীণ ভারতে এই দারিদ্র্য বেড়েছে।

দারিদ্র্য বৃদ্ধির পাশাপাশি বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে বেকারীর হার। ন্যাশনাল সার্ভে অর্গানাইজেশন (এন এস ও)-র প্রদত্ত তথ্যে বলা হয়েছিল, ২০১৭-১৮ সালে বেকারীর হার ছিল ৬.১ শতাংশ যা বিগত ৪৫ বছরে সর্বোচ্চ। এই প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সরকার প্রথমে পেশ করেনি। পরে প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু এরপর আর কোনো প্রতিবেদন পেশ হয়নি। অথচ, সেন্টার ফর মনিটারিং ইন্ডিয়ান ইকোনমি (সি এম আই ই) দেশব্যাপী বেকারীর তথ্য প্রকাশ করেছে। এদের প্রকাশিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে ১৫-১৯ বছর বয়সের যুবক-যুবতীদের মধ্যে বেকারীর হার ৪৫ শতাংশ, ২০-২৪ বছরের মধ্যে বেকারীর হার ৩৭ শতাংশ, ২৫-২৯ বছরের মধ্যে বেকারীর হার ১২ শতাংশ।

দারিদ্র্য ও বেকারীর পাশাপাশি দেশব্যাপী আয় ও সম্পদের বৈষম্য ক্রমবর্ধমান। অক্সফ্যাম-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী সর্বাধিক ধনী ৯ জন ব্যক্তির সম্পদের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা দরিদ্র ৫০ শতাংশ মানুষের মোট সম্পদের সমান। সর্বাধিক ধনী ৬০ জন শিল্পপতির মোট সম্পদের পরিমাণ কেন্দ্রীয় বাজেটের মোট প্রায় ব্যয় বরাদ্দের সমান।

বর্তমান জাতীয় অর্থনীতিতে একদিকে রয়েছে মন্দা পরিস্থিতি এবং অপর দিকে রয়েছে মুদ্রাস্ফীতি। উভয় মিলে তৈরি হয়েছে মন্দা স্ফীতি অর্থাৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে যখন ব্যাপক মন্দা, বেকারী, দারিদ্র্য, কর্মচ্যুতি ইত্যাদির জন্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় চাহিদা কমছে, যা শিল্পোৎপাদন, কৃষি উৎপাদনে সৃষ্টি করছে ভয়ঙ্কর মন্দা তখন এই অর্থনীতিকে গ্রাস করছে মুদ্রাস্ফীতি। প্রতিটি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি ঘটে চলেছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ১৪ শতাংশ এবং খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ৮

এই পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় বাজেটের বিভিন্ন দিককে বিচার করতে হবে।

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২০-২১

এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রধান প্রধান দিকগুলি হল নিম্ন রূপ---(১) আগামী পাঁচ বছরে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ১০৩ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে হবে, (২) এল আই সি সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার বিক্রি করে ২১০ লক্ষ কোটি সংগ্রহ করা হবে। গত বছরে এই বাবদ সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৬৫ হাজার কোটি টাকা, (৩) সম্পদ সংগ্রহের বা সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে, (৪) কর প্রশাসনকে উন্নত করে করদাতাদের কর প্রদানে উৎসাহিত করতে হবে, (৫) আয় করের হার পরিবর্তন করা হবে, তবে নতুন হারে যে করদাতারা কর প্রদান করবেন তারা পুরনো হারে যে ছাড়গুলি ছিল তা পাবেন না, (৬) ডিভিডেন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্স বাতিল হবে, (৭) জাতীয় শিল্পকে রক্ষা করতে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিকে এমনভাবে সংশোধন করতে হবে যাতে কাস্টমস ডিউটি হারের পরিবর্তন করা যায়, (৮) আইনের পরিবর্তন করতে হবে যাতে সমস্ত চুক্তির শর্তগুলিকে মান্যতা দেওয়া যায়, (৯) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির সংযুক্তিকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে, (১০) ব্যাঙ্কের সঞ্চিত অর্থের বীমা মূল্যের বর্তমান পরিমাণ ১ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ৫ লক্ষ টাকা করা হবে, (১১) পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য মার্কেটের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়াতে হবে, (১১) কাঠামোগত সংস্কারের ক্ষেত্রে এফ আর বি এম ব্যবস্থাকে প্রয়োগ করতে হবে, (১৩) আর্থিক ক্ষেত্রে সংস্কারের স্বচ্ছতা আনতে ডাটা ব্যবস্থাকে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাজেটে প্রস্তাবিত হওয়ার সাথে সাথে তা কার্যকর হয় না। এটি সব বাজেটের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন এবারের বাজেট বক্তৃতার বড় অংশ জুড়ে রয়েছে কৃষি সংক্রান্ত বিষয়। বাজেটে কৃষি ও সহযোগী ক্ষেত্র যেমন সেচ ও গ্রামোন্নয়ন খাতে ২০২০-২১ সালে ২ কোটি ৮৩ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যয় কী হবে? ২০১৯-২০ সালে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১.৫ লক্ষ কোটি টাকা, কিন্তু বরাদ্দ হয়েছে ১.২০ লক্ষ কোটি টাকা।

একনজরে বাজেটের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে ১২৬টি প্রকল্পে ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু এইসব প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ দেখলে বোঝা যায় না যে প্রকল্পগুলির কতটা বর্তমান বছরে আর কতটা পরবর্তী বছরে ব্যয়িত হবে।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে বর্তমান বছরে (২০১৯-২০) যে বরাদ্দ করা হয়েছিল, বর্তমান বছরে বাজেটের তুলনায় তা কম। সবুজ বিপ্লব, শ্বেত বিপ্লব, নীল বিপ্লব, পি এম জে এ ওয়াই, আয়ুষ্মান ভারত এবং প্রধানমন্ত্রী গ্রাম

বাজেট এক নজরে

(শত কোটি টাকা)	২০১৮-২০১৯ প্রকৃত	২০১৯-২০২০ বাজেট বরাদ্দ	২০১৯-২০২০ সংশোধিত বরাদ্দ	২০২০-২০২১ বাজেট বরাদ্দ
১. রাজস্ব সংগ্রহ	১৫,৫২,৯১৬	১৯,৬২,৭৬১	১৮,৫০,১০১	২০,২০,৯২৬
২. কর রাজস্ব (কেন্দ্রের প্রাপ্য)	১৩,১৭,২১১	১৬,৪৯,৫৮২	১৫,০৪,৫৮৭	১৬,৩৫,৯০৯
৩. কর বহির্ভূত রাজস্ব	২,১৫,৭০৫	৩,১৩,১৭৯	৩,৪৫,৫৩৬	৩,৮৫,০১৭
৪. মূলধনী আয়	৭,৬২,১৯৭	৮,২৩,৫৮৮	৪,৪৭,৪৫১	১০,৭১,৩০৪
৫. ঋণ পরিশোধ	১৮,০৫২	১৪,৮২৮	১৬,৬০৫	১৪,৯৬৭
৬. অন্যান্য খাতে	৯৪,৭২৭	১,০৫,০০০	৬৫,০০০	২,১০,০০০
৭. কর্জ ও অন্যান্য দায়	৬,৪৪,৪১৮	৭,০৩,৭৬০	৭,৬৬,৮৪৬	৭,৯৬,৩৩৭
৮. মোট সংগ্রহ (১+৪)	২৩,১৫,১১৩	২৭,৮৬,৩৪৯	২০,০৬,৫৫২	৩০,৪২,২৩০
৯. মোট ব্যয় (১০+১৩)	২৩,১৫,১১৩	২৭,৮৬,৩৪৯	২০,৯৬,৫৫২	৩০,৪২,২৩০
১০. রাজস্ব খাত থেকে	২০,০৭,৩৯৯	২৪,৪৭,৭৮০	২৩,৪৯,৬৪৫	২৬,৩০,১৪৫
১১. সুদ পরিশোধ	৫,৮২,৬৪৮	৬,৬০,৪৭১	৬,২৫,৭০৫	৭,০৮,২৬৩
১২. সহায়তা বরাদ্দ ও মূলধন সম্পদ সৃষ্টি	১,৯১,৭৮১	২,০৭,৩৩৩	১,৯১,৭৩৭	২,০৬,৫০০
১৩. মূলধনী খাত থেকে	৩,০৭,৭১৪	৩,৩৮,৫৬৯	১,৪৮,২০৭	৪,১২,০৮৫
১৪. রাজস্ব ঘাটতি (১০–১)	৪,৫৪,৪৮৩ (২.৪)	৪,৮৫,০১৯ (২.৩)	৪,৯৯,৫৬৪ (১.৪)	৬,০৯,৭১৯ (২.৭)
১৫. প্রকৃত রাজস্ব ঘাটতি (১০+১)	২,৬৭,৭০৭ (১.৪)	২,৭৭,৬৮০ (১.৩)	১,১৭,০০৭ (১.৫)	৪,০২,৭১৫ (১.৮)
১৬. আর্থিক ঘাটতি [৯–(১+৫+৬)]	৬,৪৯,৪১৮ (৩.৪)	৭,০৩,৭৬০ (৩.৩)	৭,৬৬,৫৪৬ (১.৮)	৭,৯৬,৩৩৭ (৩.৫)
১৭. বুনিয়াদি ঘাটতি (১৬–১১)	৬৬,৭৭০ (০.৪)	৪৩,৭৮৯ (০.২)	১,০৫,৭১৩ (০.৭)	৮৮,১৩৪ (০.৪)

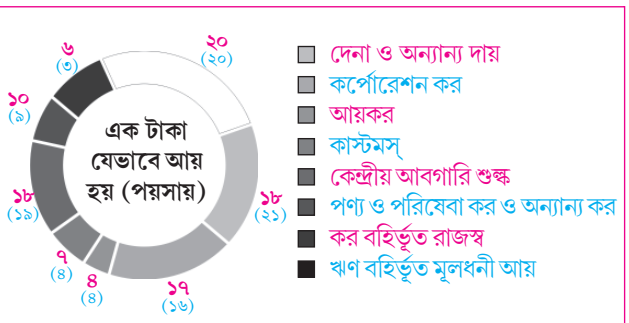

কর ও শুল্ক সংক্রান্ত প্রদত্ত তথ্যে রাজ্যের অংশ রয়েছে বন্ধনীতে প্রদত্ত তথ্যগুলি ২০১৯-২০'র বাজেট বরাদ্দ।

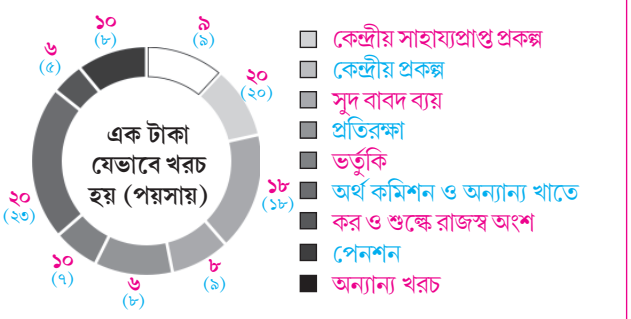

মোট ব্যয়ের মধ্যে কর ও শল্কে রাজ্যের অংশ অন্তর্ভুক্ত ২০১৯-২০'র বাজেট বরাদ্দ বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত হল।

আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে ৪ কোটি এবং ২০২৫ সালে ৮ কোটি উচ্চমানের চাকরির সৃষ্টি হবে। বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক খাতে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ অন্যান্য) সরকারী ব্যয়ের অংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় সমীক্ষায় সন্তোষ প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, ২০১৪-১৫ সাল থেকে ২০১৯-২০ সালের মধ্যে বিশেষত উচ্চশিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

আর্থিক সমীক্ষায় ভারতীয় অর্থনীতির উজ্জ্বল চালচিত্র (?) সম্পর্কে যাই বলা হোক না কেন, মানুষের অভিজ্ঞতা কিন্তু ভিন্ন। জাতীয় অর্থনীতির সবথেকে বড় ব্যাধি হল মন্দা। এর যে সমস্ত লক্ষণ তা হল---(১) জনগণের ভোগব্যয় হ্রাস, (২) সরকারী বিনিয়োগ হ্রাস, (৩) রপ্তানী বৃদ্ধি না পাওয়া ও (৪) অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় হ্রাস। প্রাপ্ত সরকারী তথ্য অনুযায়ী প্রতিটি ক্ষেত্রেই উৎপাদন বৃদ্ধির হারে নেতিবাচক চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ২০১২ সাল থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে গ্রামীণ ভোগের জন্য ব্যয় স্তর, যার প্রায় ৮০ শতাংশ জুড়ে খাদ্য সামগ্রী রয়েছে, তা ব্যাপক ভাবে ৮.৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এটি একটি সামগ্রিক চিত্র যার মধ্যে গ্রামীণ ধনী ব্যক্তিদের ব্যয়ও অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ, গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য অর্থাৎ দেশের জনসংখ্যায় অর্ধেকের বেশী প্রতিনিধিত্বকারী গ্রামীণ জনগণের ৯০ শতাংশের বেশী অংশের ভোগ ব্যয়কে যদি বিবেচনা করা শতাংশ। উভয় হারই ছিল বিগত ৫ বছরের মধ্যে সর্বাধিক। অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ একটিকে নিরাময়ের জন্য যে পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তা অপর প্রবণতাটিকে বাড়িয়ে দেবে।

বিগত এক বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলি এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে যে, অর্থনীতির এই পরিস্থিতিতে বিপুল সরকারী বিনিয়োগ প্রয়োজন। অর্থাৎ মানুষের কাছে বিপুল অর্থ পৌঁছে দিতে হবে, যার মধ্য দিয়ে চাহিদা সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বিপরীত পথে চলছে। সরকারী তথ্য অনুযায়ী কোষাগারীয় ঘাটতির বৃদ্ধি আটকাতে গিয়ে ১০০ দিনের প্রকল্প থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ প্রকল্প, কেন্দ্রীয় আবাস যোজনা, গ্রাম সড়ক আবাস যোজনার ন্যায় কর্মনিবিড় প্রকল্পগুলিতে অর্থের জোগান কমেছে।

মন্দাজনিত কারণে সরকারের বিভিন্ন আয়প্রকল্পে সরকারী রোজগার কমেছে। প্রত্যক্ষ কর এবং জি এস টি থেকে সরকারের সিংহ ভাগ আয় হয়। বর্তমান অর্থবর্ষে প্রত্যক্ষ কর অর্থাৎ আয় কর, কোম্পানী কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৩.৩৫ লক্ষ কোটি টাকা। প্রথম সাত মাসে লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৪৫ শতাংশ আদায় হয়েছে। রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে ঘাটতির এই করুণ চিত্র রাজকোষ ঘাটতির ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

সড়ক যোজনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এর ফলে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো যাচ্ছে না।

বেশকিছু ক্ষেত্রে ২০২০-২১ সালের বাজেটে যে বরাদ্দ করা হয়েছে তা গত বছরের বাজেটের তুলনায় কম অথবা সমান। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির বর্তমান হারকে হিসাবের মধ্যে ধরা হলে এইসব ক্ষেত্রে প্রকৃত বরাদ্দ কমে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ এম জি এন আর ই জি এ, স্বচ্ছ ভারত মিশন গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলে ন্যাশনাল হেলথ মিশন, জবস অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট, পি এম জে এ ওয়াই, আয়ুষ্মান ভারত, এস এ এম আর অ্যান্ড ইউ টি, অটল মিশন ফর রিজুভিনেশন অ্যান্ড আরবান ট্রান্সফরমেশন স্মার্ট সিটিজ মিশন। এইসব খাতে বরাদ্দ হ্রাস পাওয়ায় এসব কর্মসূচীর গুরুত্ব কমে যাবে। অথচ, এগুলি সবই ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচীর অংশ।

কেন্দ্রীয় বাজেটের আয়ের দিকটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর কিছু দিক আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার যে, রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হলে রাজস্ব ঘাটতি বা কোষাগারীয় ঘাটতি বৃদ্ধি পাবে। ব্যয় বরাদ্দ ছাঁটাই হবে। ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ উভয় আর্থিক বর্ষে এই ঘটনা ঘটেছে। যেমন, ২০১৯-২০ সালের রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৪.৬ লক্ষ কোটি টাকা কিন্তু সংশোধিত হিসেব অনুযায়ী এই পরিমাণ হ্রাস পেয়ে হয়েছে ২১.৬ লক্ষ কোটি টাকা। প্রাপ্ত ▶▶ *ষষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে*

১৯তম রাজ্য সম্মেলনের প্রধান অতিথি মহম্মদ সেলিমের ভাষণ (সংক্ষেপিত)

কেন্দ্র ও রাজ্যের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন

ঊনবিংশতম সম্মেলন থেকে বিংশতিতম সম্মেলনে যাত্রাপথ কী হবে নেতৃত্ব কী হবে, আন্দোলন-সংগ্রামের স্বরূপ কী হবে, দাবিদাওয়াগুলোর মধ্যে কোনগুলো অগ্রাধিকার পাবে, কীভাবে নিজস্ব কর্মসূচী নিয়ে সাধারণ প্রস্তুতি নিয়ে সরকারী কর্মচারীদের এবং সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে এখন ক্যাজুয়ালাইজেশন, কন্ট্রাকচুয়ালা ইজেশন হচ্ছে, সেইসব কর্মচারীদের সকলকে কীভাবে আপনারা সমবেত করবেন ইত্যাদি আপনাদের সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়।

আমরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন, সবাই আমরা মনে করি, এককভাবে তার সমাধান খোঁজা সম্ভব নয়। এইজন্যই সংগঠিত প্রয়াস, co-ordinated move লাগে, এইজন্যই সভা-সমিতি করতে হয়, এইজন্যই নেতৃত্ব নির্বাচিত করতে হয়, এটা একটা ধারা। এই যে মহাপুরুষদের ছবি লাগিয়েছেন, তাঁদের বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাঁরা আধুনিক সমাজ গড়ে ওঠার সময় এই ব্যবস্থার মধ্যে যেসব অন্ধকার আছে, গ্লানি আছে সেগুলো দূর করার জন্য উন্নত সমাজ তৈরীর জন্য, মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াস নিয়েছেন, লড়াই করেছেন।

আজকে যখন আপনারা সম্মেলন করছেন, মানুষের সমস্যা ক্রমবর্ধমান, অর্থনৈতিক সংকট ক্রমবর্ধমান, আবার প্রতিবাদের ওপর, আন্দোলনের ওপর মানুষের অধিকারের ওপর আক্রমণ ক্রমবর্ধমান। পারিবারিকভাবে, ব্যক্তিগতভাবে সামাজিকভাবে নানা সমস্যার আমরা সম্মুখীন হচ্ছি। পথ দুটোই। একটা চোখ বন্ধ করে কিছু না দেখার ভান করা বা না দেখা, আর একটা হচ্ছে চোখ খুলে বাস্তবতার সম্মুখীন হওয়া, বুক চিতিয়ে মাথা তুলে আত্মসম্মানের সঙ্গে নিজেদের, সমাজের, গোটা দেশের মর্যাদাকে স্থাপন করা। নিজের লক্ষ্যের দিকে অবিচল থাকা। এটা শুধু ২০১৯ থেকে ২০২০ নয়, এটা শুধু ঊনবিংশতিতম থেকে বিংশতিতম সম্মেলন নয়। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, যাহা উনিশ তাহা বিশ। কিন্তু গোটা দেশ, গোটা রাজ্যে মানুষের মুড প্রমাণ করছে—উনিশ আর বিশ সমান থাকবে না, একটা বিশাল উথালপাথালের মধ্যে থাকবে। ৮ জানুয়ারি গোটা দেশের শ্রমজীবী মানুষ, মেহনতী মানুষ, শ্রমিক-কৃষক-খেতমজুর-দিনমজুর, ছাত্র-যুব, শিক্ষক-কর্মচারী সবাই মিলে একটা বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। দাবিসনদ সামনে আছে, লড়াইয়ের মেজাজ আছে—আর আজকে সেখানে দাঁড়িয়ে আপনারা এই সম্মেলন করছেন। অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক, কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতা করালী চ্যাটার্জী বলছিলেন কীভাবে এই সম্মেলনকে ঘিরে একদিকে প্রতিষ্ঠানিক বাধা অন্যদিকে সাহায্য-সহযোগিতা-দান-অনুদান। এই হচ্ছে এখনকার সময়। এখানে একটা মিলও আছে। এর আগেও এখানে ১৯৯২ সালে সম্মেলন হয়েছে। তখন দেশ একটা বড় সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে, গোটা দেশের বুকে আগুন নিয়ে খেলা— ধর্মের নামে জিগির তুলে—বাবরি মসজিদ ভাঙার প্রেক্ষাপটে সম্মেলন হয়েছিল। আর তিন দশক বাদে আবার হচ্ছে। এই সময়ে সংকট বেড়েছে।

যারা মনে করেছিল, 'জয় শ্রীরাম হো গিয়া কাম', তাদের কি কাম হয়ে গেল? হ্যাঁ, উত্তরপ্রদেশে এখন যোগীজীর সরকার আছে। সুপ্রিমকোর্ট এই সপ্তাহে শিশুদের প্রতি অপরাধ বিষয়ে দুটো সরকারকে আন্ডারলাইন করে গাল দিয়েছে। প্রথমটা যোগীরাজ, দ্বিতীয়টা মমতারাজ। আমরা কখনও ভাবতে পারিনি উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ একই সারিতে এসে দাঁড়াবে। কারণ, কোনো বিশেষ আদালত এখনও হয়নি, শিশুদের প্রতি সংগঠিতভাবে অপরাধের pending case—এসব ব্যাপারে রাজ্যসরকারের ভ্রূক্ষেপ নেই। এটা একটা উদাহরণ। এই মুহূর্তে পুলিশের নির্যাতন হচ্ছে উত্তরপ্রদেশে, আজকেও পাঁচটা জেলায় ইন্টারনেট বন্ধ করে রাখা হয়েছে। একদিকে প্রধানমন্ত্রী বলছেন, সব পেমেন্ট হবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে—ডিজিটাল ইন্ডিয়া, সবই modern communication system-এ হবে। অথচ গোটা বিশ্বের মধ্যে ইন্টারনেট বন্ধ করার ক্ষেত্রে ২০১৮-১৯ সালে আমাদের দেশ এক নম্বরে চলে গিয়েছে। বেশিরভাগ সময় বন্ধ থাকছে। যোগাযোগ বন্ধ করা হচ্ছে, সম্পর্কটা বন্ধ করা হচ্ছে, communication মাধ্যম বন্ধ করা হচ্ছে। একদিন দেশ বন্ধ থাকলে কীরকম অবস্থা হয়? কাশ্মীরে গত আগস্ট মাস থেকে, সাড়ে চারমাসের বেশি হয়ে গেল, সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

কতগুলো বিষয় recapitulate করতে বলছি। প্রত্যেকটা সময় এটা বোঝানো হয়েছে দেশের সমস্যা নিয়ে সরকার চিন্তিত। তার থেকে তাঁরা পরিত্রাণের পথ খুঁজছেন। একেবারে গোড়ায় যদি যাই, ৯০-এর দশকে যখন আপনাদের সম্মেলন হয়েছিল, তখন আমাদের দেশে উদার অর্থনীতির কথা বলা হচ্ছিল, তখন যারা ছাত্র, যুব, কৃষক, তাদের কী বোঝানো হয়েছিল? এদেশ আমদানি বেশি করে। রপ্তানি কম করে। আমাদের বিদেশ থেকে টেকনোলজি নিয়ে আসতে হবে, তার জন্য টাকা ধার নিয়ে আসতে হবে, আমাদের বেকারসমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। নতুন ধরনের কল-কারখানা তৈরী হয়ে যাবে, আমরা গোটা বিশ্বকে রপ্তানি করবো আমদানি কম করবো, আমাদের balance of trade-এ ঘাটতি পূরণ হয়ে যাবে—এর জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করতে হবে, কিন্তু ভালো হবে। আমার মনে আছে তখন আমরা আই এম এফ-এর ঋণের বিরুদ্ধে বলছিলাম। পার্লামেন্টে তখন আমি সবে গেছি। নরসিমহা রাও প্রধানমন্ত্রী। আমরা বলছি আইএমএফ-এর শর্ত মানা চলবে না। তখন বলা হয়েছিল—যে ঋণ দেয় সে তো শর্ত দেবেই। আমরা সবচেয়ে সহজ শর্তটা মেনে নিয়েছি। কঠিন শর্ত বাদ দিয়েছি। এই প্রসঙ্গে একটা মজার গল্প মনে পড়ল। একজন গেছে ঋণ নিতে মহাজনের কাছে। ছেলে অসুস্থ ঋণ নিয়ে চিকিৎসা করাবে, টাকা নেই। বউ বলেছে যেখান থেকে পারো টাকা নিয়ে এসো। মহাজন বলল, আমি তিনটে শর্ত দেব, যেটা তোমার সুবিধে হবে সেটাই তুমি মানবে। প্রথম শর্ত, বউকে পেটাতে হবে, দ্বিতীয় শর্ত, ভাইকে খুন করতে হবে, তৃতীয় শর্ত, বেশি করে মদ খেতে হবে। লোকটা বলল, ঠিক আছে আমি বেশি করে মদ খাব। তো টাকা পেয়ে লোকটা সব টাকা দিয়ে মদ খেয়ে নিয়ে বাড়িতে গিয়ে দরজায় লাথি মারছে। বউ দরজা খুলে বলল, বললাম ছেলের অসুখ, ওষুধ নিয়ে আসতে আর তুমি মদ খেয়ে এসেছ? শুনেই রেগে সে বউকে পেটাতে শুরু করল। তার ভাই এসে বলল, দাদা কি করছ? বউদিকে মারছ? তখন সে রেগে গিয়ে ভাইয়ের মাথায় মারল। ভাই মারা গেল। তাহলে তিনটে শর্তই পূরণ হয়ে গেল। কিন্তু শুরু হয়েছিল সহজ শর্তটা দিয়ে। আমাদের দেশে তিন দশকের ইতিহাস এরকমই।

মমতা ব্যানার্জী বলেছিলেন— পরিবর্তন। দিল্লিতে যারা সরকারে এসেছেন তাঁরা বলেছিলেন 'পরাবর্তন'। (ছোটা বর্তন, বড়া বর্তন!) আসলে প্যাকেজিং করে মানুষের কাছে দক্ষিণপন্থা হাজির করছে মানব দরদী সেজে। ট্রাম্প থেকে, মোদী থেকে মমতা---উদাহরণগুলো আমাদের সামনে আছে। ফাঁটকা পুঁজি যারা বিশ্বের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে, তারা আমাদের রাজনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি, গোটা ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করতে চায়। জিও যখন বলে--- জিও জী ভরকে, করলো দুনিয়া মুট্ঠি মে,—তখন আপনার মুঠোয় দুনিয়াটা আনার কথা বলছে না, দুনিয়াটাকে তাদের মুঠোয় আনার চেষ্টা করছে। যখন আমাদের দেশের জি ডি পি কমছে, যখন ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে না, যখন বেকারী ৫০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায়, আর্থিক সংকট বেড়েছে, ব্যাঙ্কগুলোর অবস্থা খারাপ, ইনসুরেন্সগুলো লাটে ওঠার ব্যবস্থা হচ্ছে, সরকারী কোম্পানীগুলো বেচে দেওয়া হচ্ছে, সেই ফাঁকে শুধুমাত্র মুকেশ আম্বানির ব্যক্তিগত সম্পত্তি ৩ কোটি কয়েক লক্ষ থেকে ৪ কোটি ২১ লক্ষ হয়েছে--- ২৫ শতাংশ বেড়েছে একবছরের মধ্যে। আর এই চিত্রকে আড়াল করার জন্য একজন প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে আর একজন প্রতিবেশীকে শত্রু মনে করানো হচ্ছে।

একটা বহুমাত্রিক বিভাজনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সরাসরি যদি আজকের debate-এর বিষয়ে আসি, যেটা গোটা দেশ জুড়ে—এন আর সি, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে চলছে। এমনভাবে পেশ করা হচ্ছে যেন এই আইন মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের জন্য। আসলে শুধু হিন্দু-মুসলমান নয়, Its multidimensional. Language, religion, region, race, cast—যে কোনো মাধ্যমকে ব্যবহার করা হচ্ছে ভাগাভাগি করার জন্য। এভাবেই করা হয়। আমেরিকায় যেমন বলা হচ্ছে মেক্সিকানরা আসছে বলে তোমার সংকট হচ্ছে, তোমার চাকরি খেয়ে নিচ্ছে। ইউরোপে যেমন বলা হচ্ছে এশিয়া, সাউথ এশিয়া, আফ্রিকা থেকে লোক চলে আসছে বলে তোমার সংকট হচ্ছে। লন্ডনে বরিস জনসন যা করছে। গত এক বছর আগে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে যখন রাজস্থান, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন ছিল, তখন আসামে এন আর সি-র ড্রাফট লিস্ট বেরিয়েছিল, ৪০ লক্ষ লোকের নাম বাদ গেছিল। আজকে যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেই অমিত শাহ বলেছিলেন, উইপোকা আমাদের দেশকে কুরে কুরে খেয়ে নিচ্ছে। এমনি এমনি 'উইপোকা' বলেননি। যারা ধর্মের নামে জাতির নামে রাজনীতি করে, তারা ঘৃণার উদ্রেক করার জন্য মানুষকে এইধরনের কীট-পতঙ্গ-পশু হিসেবে প্রতিপন্ন করে। যাতে মানবিক দিক থেকে মানুষ দানবিক হয়ে ওঠে, যাতে ঘৃণার শিকার হয় এবং যেহেতু উইপোকা হলে তাকে মারতে হবে, তাকে বিষ প্রয়োগ করতে হবে। এইভাবে প্ররোচিত-উত্তেজিত করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে যেহেতু ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচন আছে, আজকে নাগরিকতার প্রশ্নে বলা হচ্ছে যারা উদ্বাস্তু এসেছে এদের মধ্যে যারা বাঙালী হিন্দু উদ্বাস্তু তাদের নাগরিকতা দেওয়া হবে, আর যারা মুসলমান তাদের বাদ দিতে হবে। এই কারণেই তো গত একবছর ধরে বলছিল ২ কোটি লোককে বাংলা থেকে তাড়িয়ে দেব। এই নাগরিকত্ব কি বড় সমস্যা হিসাবে আমাদের সামনে এসেছে, যে কে নাগরিক কে নাগরিক নয়, কে পুবের কে পশ্চিমের? তা ঠিক করতে হবে। আমরা দেশ ভাগের শিকার হয়েছি, ছিন্নমূল মানুষের স্রোত এসেছে, তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের জন্য, পা রাখার জমির জন্য লড়াই হয়েছে, লাল ঝাণ্ডা নিয়ে যারা লড়াই করেছে। উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতা ছিলেন সমর মুখার্জী, ট্রেড ইউনিয়নের প্রখ্যাত নেতা, তিনি পূর্ব বাংলার মানুষ ছিলেন না। তিনি হাওড়ার আমতার মানুষ ছিলেন। কিন্তু তিনি উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতা ছিলেন, সংসদের ভিতরে সংসদের বাইরে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য লড়াই করেছেন। তখন তো কে ঘটি কে বাঙাল দেখা হয়নি। এমনি আমাদের ইলিশ-চিংড়ি ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান নিয়ে নুক-ঝুক হয়। কিন্তু বাজারে, হাটে, দোকানে, অফিসে, আদালতে এই ভাগটা হয়নি। বামপন্থী মানে এটাই—Social integration। আন্দোলন সংগ্রামের একটা বড় প্রাপ্তি ভাষা-জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ কাছাকাছি আসে, ঐক্য তৈরী হয়।

আসামে বামপন্থীরা দুর্বল ছিল। তার মধ্যেও লড়াই হয়েছে। আসামে প্রথম থেকেই অসমিয়া-বাঙালী বিভাজনকে উস্কে দেওয়া হয়েছে রাজনৈতিক স্বার্থে। আমাদের ছাত্রাবস্থায় যখন আসামে আন্দোলন চলছে : 'বাঙালী খেদাও', তখন বিজেপির তৎকালীন নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ী পার্লামেন্টে বলেছিলেন, এটা স্বাধীনতার পরে শ্রেষ্ঠ ছাত্র-যুব আন্দোলন। ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, বামপন্থী সাংসদ সেদিন পার্লামেন্টে তুলোধোনা করেছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ীকে—অন রেকর্ড বলেছিলেন, আপনি সর্বনাশ করছেন দেশের, আগুন নিয়ে খেলছেন। উগ্র জাতীয়তাবাদের নামে, ভাষাপ্রেমের নাম করে যে ভাষা ভিত্তিক বিভাজন করার চেষ্টা ---এটা আগুন নিয়ে খেলা। এটা শুধু আসামে সীমাবদ্ধ থাকবে না। গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়বে। এই হচ্ছে বামপন্থী আন্দোলনের নেতা। ভবিষ্যৎ কী হতে যাচ্ছে সেদিন ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত দিক নির্দেশ করেছিলেন।

গত নির্বাচনের সময়ে আমাদের রাজ্যে বলা হয়েছিল গুজরাট মডেল নিয়ে আসা হবে। অনেকে মনে করেছিলেন কল-কারখানা হবে, ঝাঁ চকচকে রাস্তা হবে। আমরা সবাই ঢোকলা খেতে অভ্যস্ত হয়ে যাব। বলেছিল, ঢোকলা, খাইয়েছে ধোকা! এখন আর গুজরাট মডেলের কথা বলছে না, বলছে আসাম মডেল। আসাম মডেল কী? আমাদের যেমন অর্থনীতির বিভিন্ন ধাপ থাকে, রাজনীতির-সমাজ বিভিন্ন ধাপ থাকে, সেরকম বিভিন্ন রাজ্যে আমরা বিভিন্ন Political-social ladder-এ আছি। আজকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যা হচ্ছে, গত ২০-৩০ বছর ধরে আসামে তা হয়েছে। একদিনে এন আর সি হয়নি। এইজন্য আমরা বলেছি আসাম থেকে শিক্ষা নিতে হবে। আসামে এই বিভাজনটা করা হল ভাষার নামে, গোটা দেশের মানুষ— বর্হিবঙ্গের মানুষ, অন্তর্বঙ্গের মানুষ, আসামের মানুষ, গণতান্ত্রিক মানুষ একযোগে বললেন, এই বিভাজন করবো না। তারপর জাতিসংগঠন করা হল আলাদা আলাদা। বহুমাত্রিক বিভাজনের উদাহরণ আসাম। তারপর ধর্মের নামে রাজনীতি হল। সঙ্ঘ পরিবার বলল, হিন্দুদের জন্য একরকম, মুসলমানদের জন্য আরেক রকম হবে। কেন সেটা সফল হল? তার আগে জামায়েত-উলেমা হিন্দ দল করল। প্রেসিডেন্ট মোল্লা বদরুদ্দীন আহমেদ। এখানে যেমন সিদ্দিককুল্লা জামায়েত-উলেমা হিন্দের প্রেসিডেন্ট হয়েছিল। অনেকে মনে করল, মুসলমানের স্বার্থরক্ষা হবে। বিভাজনটা হল। একটা রুটিকে মাঝখান দিয়ে কাটলে দু'টুকরো আবার মাঝখান দিয়ে কাটলে চার ফালি হয়ে যায়। ভাষার নামে একটা, ধর্মের নামে একটা—খাড়াখাড়ি একটা, আড়াআড়ি একটা—চারভাগে ভাগ করা হল। সঙ্ঘ পরিবার বলছে, হিন্দু উদ্বাস্তুদের জন্য সংসদে এই আইন করে নিয়ে এসেছি। ৪০ বছর ধরে সারা দেশে এরা stigmatize করেছে যে, বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী। অন্য কোনো দেশের সঙ্গে অনুপ্রবেশকারী কথাটা যুক্ত হয়ে নেই, কেবল বাংলাদেশের সঙ্গেই আছে। এমনভাবে coinage করা হয়, যতবার illegal migrant বলা হবে, বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীই মনে হবে। phrasal হয়ে যায়। এখন বলছে, নাগরিকত্ব দেবো। ৪ দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গে, আর্যাবর্তে রাজনীতি করার স্বার্থে stigmatize করেছে—বাঙালী উদ্বাস্তু মানেই অনুপ্রবেশকারী। আজকে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, তিনি এন পি আর বিরোধী। বি জে পি চালাকি করে বলে যে মনমোহন সিং-এর সময়ে আইন হয়েছিল। তা তো নয়, ২০০৩ সালে আইন সংশোধন হয়েছিল। যখন ২০০৩ সালে এনআরসির বিষয়টা এসেছিল, সেদিনও বামপন্থী সাংসদ সোমনাথ চ্যাটার্জী বলেছিলেন, এ আইন সংশোধন করা যাবে না। ১৯৮৬ সালে যখন নাগরিকতা আইন সংশোধন হয়েছিল, সে সময়ে পি চিদাম্বরম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তখনও সোমনাথ চ্যাটার্জী বামপন্থী বেঞ্চ থেকে বলেছিলেন, আসাম দেখিয়ে যে নাগরিকতা আইন সংশোধন করা হচ্ছে, ভবিষ্যতে সেটা গোটা দেশে প্রসারিত হবে। তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, এটা শুধু আসামের জন্য করছি, গোটা দেশের জন্য নয়। আজকে যে এন পি আর-এর concept এসেছে সেটা হল ২০০৩-এ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে। এখানে ওঠে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন। তিনি জানতেন না কী হচ্ছে? তখন তিনি বাজপেয়ী সরকারের সঙ্গে ছিলেন। ২০০৫ সালে ভোটার লিস্টের তাড়া ডেপুটি স্পিকারের মুখের ওপর ফেলেছিলেন। স্পিকার আসনে সোমনাথ চ্যাটার্জী। হঠাৎ উঠে গিয়ে বললেন, আমার কাছে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার লিস্ট আছে। আর বাংলাদেশেরও ভোটার লিস্ট আছে। পশ্চিমবঙ্গের ভোটার লিস্টে বাংলাদেশীদের নাম ঢুকে গেছে, এগুলো বার করতে হবে। না হলে ভোট হবে না। ২০০৬ সালে বিধানসভার ভোট ছিল।

আসাম আন্দোলন শুরু হয়েছিল মঙ্গলদীপ বিধানসভা উপনির্বাচন নিয়ে। উগ্র জাতীয়তাবাদীরা বলেছিল ভোটার লিস্টে বাংলাদেশীদের নাম আছে। তাই d-voter, তারপর ডিটেনশন ক্যাম্প। এখন যখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, না, এন আর সি হবে না। মানুষ মানছে? আপনাদের সরকারী অফিসগুলোর ব্লক অফিসে, বি এল আর ও অফিসে, পোস্ট অফিসে, ব্যাঙ্কে, রেশন অফিসে সবাই নামের তালিকা ঠিক করাচ্ছে। পুজোর সময় মালদা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুরের লোক লাইন দিয়ে রাত জেগে ইট পেতে বসে আছে। কন্ট্রোলের জমানায় যেরকম হত, দুর্ভিক্ষের সময় যে রকম হয়েছিল, যুদ্ধের সময় যেরকম হয়। কেন? একজন মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, হবে না। সে রাজ্যের মানুষ বলছে, না তোমাকে বিশ্বাস করি না, আমার কাগজটা ঠিক করে রাখতে হবে। এর চেয়ে দুর্ভাগ্য হতে পারে? এখানেই তফাৎ। যখন জ্যোতি বসু দাঁড়িয়ে বলেছেন, এখানে দাঙ্গা হতে দেব না, শিখ বিরোধী দাঙ্গার সময় হোক বা ১৯৯২ সালে, রাজ্যের মানুষের ভরসা তৈরী হয়েছে। একেই বলে Leadership। এখন মুখ্যমন্ত্রী রাস্তায় নেমে মিছিল করছেন, যখন গোটা রাজ্যের মানুষ, গোটা দেশের মানুষ ছাত্র-শিক্ষক গবেষকরা কয়েকমাস ধরে রাস্তায় নেমেছেন!

আমাদের দেশের শাসকরা মনে করেছিলেন, যেই নাগরিকতা আইন সংশোধন করব, যে দেশের খবরের কাগজে টেলিভিশনে তারস্বরে রোজ মুসলিম পার্টি হিন্দু পার্টি করা হচ্ছে, তারা বলবে মুসলমানদের বাদ দেবে আর হিন্দুদের রাখবে। সুতরাং মুসলমানদের মধ্যে একটা ভয়-ভীতি-শঙ্কা থাকবে। তারা রাস্তায় নেমে যাবে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর মতো লোকেদের নেতৃত্বে। আর তখন সঙ্ঘ পরিবার বলবে, দ্যাখো, মুসলমানরা সংগঠিত হচ্ছে, আমাদের হিন্দুদের সংগঠিত হতে হবে। কিন্তু সে গুড়ে বালি দিয়ে আই আই টি, আই আই এম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা হিন্দু-মুসলমান, ভাষা নির্বিশেষে এককাট্টা হয়ে আন্দোলন করল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীটি বিলের কপি ছিঁড়ে ফেলে কী স্লোগান দিয়েছিল?--- হাম কাগজ নেহি দিখায়েঙ্গে। আর তার পর?---ইনকিলাব জিন্দাবাদ। প্রতিবাদের, defiance-এর স্লোগান—ইনকিলাব জিন্দাবাদ। মা-মাটি জিন্দাবাদ বলেনি। কারণ ওটা দিয়ে প্রতিবাদ হয় না।

একদিকে defiance, আর এক দিকে compliance। শিরদাঁড়া যার সোজা থাকবে তার mood-টা defiance-এর। আর শিড়দাঁড়া যার সোজা থাকবে না সে compliance করবে। Compliance করে কত দূর যাবে? সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেও সম্পূর্ণ হবে না। কাগজ নেহি দিখায়েঙ্গে কেন বলেছে? একটা Joke বলি। রাস্তায় এক স্কুটারওয়ালাকে পুলিশ ধরেছে। হেলমেট আছে, পলিউশান সার্টিফিকেট আছে, ইনস্যুরেন্স আছে, ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে, পারমিট আছে, সব ঠিক আছে দেখে তাকে ছেড়ে দিয়েছে। এদিকে বাড়িতে ১০০০ টাকার ফাইনের নোটিশ পাঠিয়েছে। তখন সে আবার পুলিশের কাছে গেছে। পুলিশ বলছে---সব তো ঠিক হ্যায়, লেকিন কাগজ প্লাস্টিককে অন্দরমে কিঁউ রাখা থা? জানো না প্রধানমন্ত্রী বলে দিয়েছেন—নো প্লাস্টিক। এন আর সি, এন পি আর-এর ক্ষেত্রেও তাই।

যদি racial profiling করে, religious profiling করে, যদি আগে থেকে নেতা বলে দেয় যে 'দু' কোটিকে বার করব', আর যদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিন্দি সিনেমায় ভিলেনের মতো বলে 'চুন চুনকে নিকালেঙ্গে', তাহলে কে কটা কাগজ দেবে? আগামী কয়েকবছর এ রাজ্যে, এদেশে অন্য কোনো কাজ আর হবে না, শুধু জেরক্স হবে, আর সবাই document জোগাড় করতে থাকবে। তাহলে কেন করছে এটা?

কেন তরুণ ছেলেমেয়েদের মধ্যে এত বেশি বিদ্রোহ? social scientist-দের

▶▶ সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদকের সাক্ষাৎকার

▶তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

জনপ্রিয়তা রয়েছে। তাই তাঁকে প্রকাশ্য অধিবেশনে বক্তব্য রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে। সংলগ্ন জেলাগুলি থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ আসবেন জানিয়েছেন। নদীয়া, বাঁকুড়া থেকে ৫টি করে বাসে মানুষ আসবেন। এছাড়া আরও কয়েকটি জেলার কর্মচারীরা বাসে এবং ট্রেনে করে সমাবেশে আসবেন।

সংগ্রামী হাতিয়ার ঃ সম্মেলনের মঞ্চসজ্জা, শহীদ বেদী ও অন্যান্য সাজসজ্জায় রয়েছে যথেষ্ট পরিকল্পনা ও শিল্পের ছাপ। এবিষয়ে যদি কিছু বলেন।

করালী চ্যাটার্জী ঃ লাল পতাকা তৈরী করার কারিগর হিসেবে এমন একজন ভালো মানুষের সন্ধান আমরা পেয়েছিলাম যিনি রক্তপতাকা নির্মাণের মধ্যেই মহান হয়ে আমাদের হৃদয়ে রয়ে গেলেন। সাধারণত এখন পতাকা তৈরীর দর্জি সেভাবে মেলে না। আমরা তাঁকে ১০০০ পতাকা তৈরী করতে বলেছিলাম। অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে প্রায় ৮০০টি পতাকা সেলাই করার পরে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। আবার যে ব্যাকড্রপটি মঞ্চের পিছনে দেখতে পাচ্ছেন সেটিও এমন একজন শিল্পীর শিল্পকর্ম যিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ এবং বিছানায় বসেই এই অনুপম ছবিটি এঁকেছেন আমাদের সম্মেলনের জন্যে। চিত্রটিতে পুঁজিবাদের সাথে শ্রমজীবীদের দ্বন্দ্ব, মানুষের সংগ্রাম এবং শোষণমুক্ত সমাজের এক ভাবনা ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী। হলের ফ্লেক্সগুলিতে এক একটি বিষয়কে তুলে ধরা হয়েছে। শহীদ বেদীটি তৈরি হয়েছে সোভিয়েত রাশিয়ায় একটি স্মারকের অনুকরণে। দু'কোটি মানুষের জীবনের বিনিময়ে ফ্যাসিবাদী শক্তিকে পরাস্ত করার মর্মন্তুদ অথচ গৌরবময় শহীদ স্মৃতি এটি।

সংগ্রামী হাতিয়ার ঃ স্থানীয় প্রশাসন ও রাজনৈতিক শক্তির পক্ষ থেকে কীরকম সহায়তা পাওয়া গেছে?

করালী চ্যাটার্জী ঃ সারা রাজ্যে না হলেও লোকসভা নির্বাচনের পরে মানুষ খানিকটা খোলা আকাশ মনে করছেন। শাসকশ্রেণী খানিকটা চাপে পড়ছে বলে মনে হয়। আমাদের সম্মেলনে প্রশাসনের তরফ থেকে বেশ সহায়তা পাওয়া গেছে যা কিছুটা বাড়তি উৎসাহ জুগিয়েছে বলে আমাদের মনে হয়েছে। জেলা শাসক, মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ, পুলিশ প্রশাসন প্রত্যেকেই আমাদের যথেষ্ট সহায়তা প্রদান করেছেন, এজন্য তাঁদের আমরা ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই। তবে, ২০১২ সালের অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। তাই আমরা আত্মসন্তুষ্ট ছিলাম না। এখনও পর্যন্ত সেরকম কোনো বাধা আসেনি। □

পত্রিকার পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শাশ্বতী মজুমদার, কুমকুম মিত্র ও সৌমেন ঘোষ।

রাজ্য বাজেট ২০২০-২১

▶তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয় এবং ওবিসি শ্রেণীর শিক্ষার সুবিধার জন্য একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়।" এজন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। জাতি, সম্প্রদায় ও ধর্মের ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে এমন বিভাজন দেশে কোথাও সম্ভবত হয়নি। বাজেট বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ''মতুয়া সম্প্রদায়ের অবদানকে মনে রেখে কৃষ্ণনগরে তার একটি শাখা সহ ঠাকুরনগরে হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়, মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষ্ণনগরে কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দিভাষী সমাজের সুবিধার জন্য হাওড়ায় হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিং হিল ইউনিভার্সিটি, পূর্ব মেদিনীপুরে মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয় ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় একটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়।"

রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গড়ে উঠেছিল আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস খোলা হয়েছিল। তার সাথে ধর্মের কোনো সংযোগ ছিল না। কিন্তু এবারের রাজ্য বাজেট ভাষণে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে ধর্মের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। বাজেটে আরও বলা হয়েছে যে বিগত ৮ বছরে নাকি রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১২ থেকে বেড়ে হয়েছে ৪২। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হলো, রাজ্যে বেসরকারী ও প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত যোগ করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এই সংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে। আসল বিষয়, যেটা এতদ্‌সত্ত্বেও এড়ানো যায়নি তা হলো রাজ্য সরকার শিক্ষা খাতে গত বছরের তুলনায় বরাদ্দ কমিয়েছে ৬৮.২৬ শতাংশ।

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বিভিন্ন সহায়তা ভাতা প্রদান করা হতো আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে। গরিবদের দেওয়া হতো অগ্রাধিকার। বর্তমান তৃণমূল শাসনে সে সবের বালাই নেই। বাজেটে তফশিলি জাতির বৃদ্ধদের জন্য 'বন্ধু' নামে পৃথক একটি প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। একইসঙ্গে বামফ্রন্ট আমলে চালু হওয়া আদিবাসী গরিব কৃষকের পেনশনের চালু প্রকল্পের নাম বদলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু তফশিলিদের জন্য পৃথক প্রকল্প চালু হলেও ও বি সি ভুক্ত কৃষকদের জন্য কোনো সংরক্ষণ নেই।

বাজেটে বেকারদের কর্মসংস্থানের সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য নতুন প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ার প্রস্তাব রয়েছে বাজেটে। ইউ পি এস সি-র ট্রেনিং সেন্টার না হয় হলো, কিন্তু পি এস সি-র কী হবে! এস এস সি-র পরীক্ষা কবে হবে? ২০১৫ সালে প্রাথমিক টেট পরীক্ষার নির্দেশিকা জারি হয়েছিল, এখনও তার পরীক্ষা নেওয়া হলো না কেন? —এসবের কোনো উত্তর বাজেট প্রস্তাবে নেই।

সর্বোপরি রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা বিহীন সংশোধিত বেতন চালু হওয়ার পর এই বাজেট পেশ করা হলেও, বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী মহার্ঘভাতা সম্পর্কে একটি শব্দও খরচ করেন নি। আর মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে 'টাকা এলে তখন দেখা যাবে' গোছের মন্তব্য করে বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। এক কথায় অন্যান্য অংশের মতো সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও এই বাজেট শুধুমাত্র বঞ্চনাই উপহার দিয়েছে।

একথা বলা যায় যে, এবারের রাজ্য বাজেট শুধু ভিত্তিহীন আকাশকুসুম দাবিতে পরিপূর্ণ নয়। তা চূড়ান্ত বিভ্রান্তিমূলকও বটে। □

সি এ এ-এন পি আর-এন আর সি এবং ডি এ বিহীন বেতন সংশোধনের প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে কর্মচারী বিক্ষোভ

গত ২১, ২২ জানুয়ারি এবং ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এবং কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তরগুলিতে, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে টিফিন বিরতিতে কয়েক হাজার কর্মচারী বিক্ষোভ সভা ও মিছিলে অংশগ্রহণ করলেন। সি এ এ, এন পি আর, এন আর সি বাতিল করো, ধর্মীয় বিভাজন রুখে দাও, দেশের সংবিধানের উপর আঘাত মানছি না প্রভৃতি দাবি স্লোগান মুখরিত মিছিল ও মিছিল শেষে বিক্ষোভ সভা হয়, গত ২১, ২২ জানুয়ারি প্রতিটি জেলায় জেলাশাসকের দপ্তর সংলগ্ন এলাকায় এবং কলকাতার নবমহাকরণ, মহাকরণ, বিকাশ ভবন, স্বাস্থ্য ভবন, বাণিজ্য কর দপ্তর প্রভৃতি সরকারি দপ্তরগুলিতে। এই সভা ও মিছিলগুলি থেকে একই সাথে রুটি-রুজির লড়াইকে জোরদার করার ডাক দেওয়া হয় এবং ধর্মীয় বিভাজন করার কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের অস্পষ্ট অবস্থানেরও সমালোচনা করা হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃত্ব এই সভাগুলিতে বক্তব্য রাখেন।

একই ভাবে সারা রাজ্য জুড়ে গত ৪ ফেব্রুয়ারি সংশোধিত বেতনে মহার্ঘভাতা না দেওয়ার রাজ্য সরকারের যে সিদ্ধান্ত তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন হাজার হাজার কর্মচারী। মহার্ঘভাতা বিহীন পে-স্লিপ হাতে নিয়ে কর্মচারীরা ঐ দিনের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। ঐ কর্মসূচী থেকেই সি এ এ, এন পি আর, এন আর সি-র বিরুদ্ধে সপ্তাহব্যাপী স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়। □

কেন্দ্রীয় বাজেট

▶চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

তথ্যে দেখা যায় যে, সমস্ত ধরনের কর বা রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ কমেছে। এর ফলে ব্যয় বরাদ্দ ছাঁটাই করতে হবে। ২০২০-২১ সালে জি ডি পি বৃদ্ধির হার কমে যাওয়ায় রাজস্ব সংগ্রহ কম হবে। পরিকাঠামোগত উন্নয়ন খাত সহ বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ ছাঁটাই করতে হবে।

রাজস্ব সংগ্রহের সমস্যার সমাধানে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র থেকে বাজেটের মাধ্যমে বা বাজেট বহির্ভূত ভাবে সম্পদ সংগ্রহের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। বাজেটে প্রস্তাবিত বরাদ্দ ছিল ৪.৪৪ লক্ষ কোটি টাকা। পরে এর পরিমাণ বৃদ্ধি করে ৬.২২ লক্ষ কোটি করা হয়েছে। এছাড়া ২০২০-২১ সালে বিলগ্নীকরণের লক্ষ্যমাত্রা ২ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। ২০১৯-২০ সালে এই ক্ষেত্রে সংশোধিত সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৬৫ হাজার কোটি টাকা। এবছরের প্রস্তাবিত সংগ্রহের সিংহ ভাগ আসবে এল আই সি থেকে, যার পরিমাণ ১ লক্ষ কোটি টাকা। বিভিন্ন মহল থেকে এই প্রশ্ন উঠছে যে, সংশোধিত হিসেবে যেখানে বিলগ্নীকরণের পরিমাণ মাত্র ৬৫ হাজার কোটি টাকা, সেখানে ২০২০-২১ সালে ২ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকা কিভাবে সংগৃহীত হবে। স্বভাবতই এই প্রশ্ন উঠছে যে গত আর্থিক বছরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঞ্চিত ভাণ্ডার থেকে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছিল। এবারেও কি এই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে?

এই পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হল, এই বাজেট অর্থনীতিতে কতটা চাহিদা সৃষ্টি করবে? বর্ধিত চাহিদায় দেশের শিল্প উৎপাদন ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার কতখানি সম্ভব? বৃদ্ধির হার কতটা বাড়ানো সম্ভব? ঘাটতি পূরণে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করে নতুন চাহিদা সৃষ্টি হবে। নির্দিষ্ট পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহের মাত্রার মধ্যে যদি বাজেটে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয় তাহলে ঘাটতি বৃদ্ধি পেতে পারে। একই ভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যয়ের সীমার মধ্যে যদি করের পরিমাণ হ্রাস করা হয়, তাহলেও করের ঘাটতির পরিমাণ বাড়বে। সুতরাং কর হ্রাস বা ব্যয়বৃদ্ধি উভয়ই ঘাটতির বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত বিশ্বাস হল যে, বেসরকারী বিনিয়োগ হ্রাস পাচ্ছে কারণ তাদের মুনাফা হ্রাস পাচ্ছে। সুতরাং কর্পোরেট হাউসের দেয় করের হার হ্রাস করতে হবে। গত আর্থিক বছরে ১.৪৫ লক্ষ কোটি টাকা কর ছাড় দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ধারণা, করের পরিমাণ হ্রাস করা হলে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। কেন্দ্রীয় সরকার শিল্পপতি বা বিত্তশালীদের বিপুল পরিমাণ কর ছাড় দিচ্ছে। লক্ষ্য হচ্ছে যে, তাদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। তাদের হাতে ইতোমধ্যেই বিপুল অর্থ জমা রয়েছে। ফলে নতুন করে এদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ নেই। আর বি আই-এর হিসেব অনুযায়ী বর্তমানে মোট উৎপাদন ক্ষমতার ৭০ শতাংশ ব্যবহৃত হয়। বাকি অংশ অব্যবহৃত থাকে। দেশের পূর্ণ শিল্প উৎপাদন ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে হলে গরিব মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এদের হাতে অর্থের যোগান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তবেই জাতীয় অর্থনীতিতে চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। যার কোনো দিশা এবারের বাজেটে পাওয়া যাচ্ছে না।

উপসংহার ঃ পূর্বোক্ত প্রেক্ষাপটে বলা চলে যে এই বাজেট দ্বিচারিতাপূর্ণ। এখানে জনগণের স্বার্থে কোনো পদক্ষেপ নেই। এটি কার্যত দেশ বিক্রির এক নিকৃষ্ট দলিল। নব্যউদারনীতির নীল নকশা লাগু করা এই বাজেটকে প্রত্যাখান করতে হবে। একই সাথে আমাদের বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরতে হবে। এই বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নলিখিত দাবিগুলির ভিত্তিতে গড়ে উঠবে। দাবিগুলি হল---(১) খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এই লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি পরিবারকে (আয়কর দাতা ব্যতীত) মাসে ৩৫ কিলো করে খাদ্যশস্য ২ টাকা কিলো দরে সরবরাহ করতে হবে। (২) সকলের জন্য শিক্ষা এই দাবিকে সামনে রেখে শিক্ষাখাতে বাজেটের ৬ শতাংশ বরাদ্দ করতে হবে। (৩) সর্বজনীন চিকিৎসার দাবিতে চিকিৎসা খাতে জি ডি পি-র ৩ শতাংশ বরাদ্দ করতে হবে। (৪) যাদের বিকল্প কোনো আয় নেই, ৬০ বছর বয়সের পর তাদের ন্যূনতম ১০ হাজার টাকা পেনশন দিতে হবে। (৫) সকলের জন্য সুন্দর কর্মসংস্থান চাই। (৬) রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে রক্ষা করতে হবে। □

ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এইচ বি রোড)-এর রাজ্য সম্মেলন

▶ অষ্টম পৃষ্ঠার পর

হচ্ছে। এরই নাম পুঁজিবাদ। এই চিন্তার বিরোধিতায় এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, আমরা কখনোই একা হতে পারি না। জন্মের পর থেকেই আমাদের কারো না কারো সাহায্যে পথ চলা, এগিয়ে যাওয়া। খাদ্য থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রতেই আমাদের অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়। তাই এটা ভাবাটাও তো আমাদেরই কর্তব্য যে, সমাজকে আমরা কতটা ফিরিয়ে দিচ্ছি? মানুষের সমস্যায় কতটা এগিয়ে আসছি। সম্মেলনে প্রধান বক্তার ভাষণে সারা ভারত সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের চেয়ারপার্সন সুভাষ লাম্বা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের চাপকে বারবার অগ্রাহ্য করে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করেছিল, যতদিন আমরা আছি ততদিন নিউ পেনশন স্কিম এরাজ্যে চালু করবো না। কিন্তু আমরা দেখলাম, একদিকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা থেকে গেলো আর সাথে সাথেই এটা কার্যকর হয়ে গেলো। এরাজ্যে মিস কলের যে নম্বর নির্বাচনের আগে দেওয়া হয়েছিল বেকার যুবকরা তাতে ফোন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছেন, কিন্তু সেই ফোন আর কেউ তুলছেন না। মিস কলে চাকরি আর মিলছে না। এসবের বিরুদ্ধে কর্মচারী সমন্বয় কমিটি কথা বলছে বলেই তাঁদের উপর আক্রমণ নেমে আসছে। অফিস দখল হচ্ছে, অনৈতিক বদলি, বরখাস্ত করা হচ্ছে। আমি আজ এই সম্মেলনে দাঁড়িয়ে আপনাদের যে কথাটা বলতে চাই তা হলো—ত্রিপুরার লড়াকু কর্মচারীরা মনে রাখবেন, আপনারা একা নন। আপনাদের এই লড়াইয়ের পাশে গোটা দেশের ৬ লক্ষ রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা রয়েছেন। দেশে লাগামহীন উদারীকরণের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার সমস্ত জমি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিদেশী কর্পোরেটদের হাতে। দেশের প্রতিরক্ষার অস্ত্র তৈরির কারখানারও আজ বরাত পেতে চলেছে বেসরকারী সংস্থা। আমরা যখন রাস্তায় সরকারী বাসের সংখ্যা আরও বাড়াতে বলছি তখন উল্টে ভারতীয় রেলকেই তুলে দেওয়া হচ্ছে বেসরকারী হাতে। ১৫০টি ট্রেন ইতিমধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বেসরকারী মালিকানায়। হাত পড়ছে দেশের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিজার্ভ টাকায়। কর্মসংস্থান তলানিতে, আই আই টি পাশ আউট ইঞ্জিনিয়ারকেও বেকারের খাতায় নাম লেখাতে হচ্ছে। সরকার এসব বিষয়ে চিন্তা না করে, এন আর সি, সি এ এ, এন পি আর নিয়ে ব্যস্ত। আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করি। লড়াইয়ের ময়দানে দাঁড়িয়েই এই পরিস্থিতির বদল ঘটাতে হবে। গত ৮ জানুয়ারি সর্বভারতীয় ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে দেশের শ্রমজীবী মানুষ এক নতুন ইতিহাস রচনা করেছেন। যা আগামীর লড়াইকে আরও শক্তি যোগাবে।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ বলেন, পশ্চিমবাংলার ধারাবাহিক আন্দোলনের চাপেই মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে আজ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন নেতৃত্বকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আলোচনার জন্য। আমরা তো নবান্নতে গিয়েছিলাম অবরোধ করতে। এই মুখ্যমন্ত্রী আমাদের জেলে পুরেছেন, নেতৃত্বকে দুরদূরান্তে ট্রান্সফার করেছেন, আবার তিনিই আমাদের ডাকছেন। এটা বুঝতে হবে কতটা আতঙ্কে এখন তিনি আছেন। আমরা লড়াইয়ের পথ ছাড়িনি। তাই, লড়াইয়ে যেতে হবে। বড়ো বড়ো লড়াই। কীভাবে যাবেন, সেটা এখানকার নেতৃত্ব বুঝবেন। আমরা পশ্চিমবঙ্গে জে এন ইউ নিয়ে, এন আর সি নিয়ে কর্মসূচী করেছি। আপনাদের প্রতিনিধিদের আলোচনায় শুনছিলাম, কীরকম শারীরিকভাবে পর্যন্ত আক্রান্ত হতে হচ্ছে শুধুমাত্র সংগঠন করার অপরাধে। এ ঘটনা আমাদের রাজ্যেও আমরা দেখেছি। অফিসের মধ্যে ঢুকে মারা হয়েছে, রক্তাক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এভাবে তো চলতে পারে না। পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে বাধ্য। সে পরিবর্তনের জন্য চাই লড়াই। এ লড়াই আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের সাথে ত্রিপুরার একটা নাড়ির টান রয়েছে। এই যোগাযোগের মধ্য দিয়ে একে অপরের এই যে পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে তাকে মোকাবিলা করে রাজনৈতিক ভারসাম্যের পরিবর্তনের লক্ষ্যে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমরা আমাদের সম্মেলনে স্থির করেছি লড়াইকে আগামী দিনে আরও তীব্র করা হবে। আপনাদের প্রতিনিধি আলোচনায়ও একই বিষয় ধ্বনিত হয়েছে, তাই সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে এই লক্ষ্যে আপনারা এগিয়ে যাবেন—এ বিশ্বাস আমার আছে। এছাড়াও সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন সি আই টি ইউ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষে সমর চক্রবর্তী।

সামনে আরও জোর লড়াই

প্রতিনিধি আলোচনায় ঘুরেফিরে শুধু একটা কথাই এসেছে, তা হলো—আমরা আক্রান্ত কিন্তু থেমে নেই। এমন কোনো মহকুমা নেই যেখানে আমাদের সংগঠনের অফিস আক্রান্ত হয়নি। তালা দিয়েছে, আগুন লাগিয়েছে, ভেঙে দিয়েছে কিন্তু তবু আমরা থেমে থাকিনি। তালা ভেঙেছি, সাহসে ভর করে অফিস বাড়িতে ঢুকেছি, প্রয়োজনে আদালতে গেছি কিন্তু ময়দান ছাড়িনি। একই সুর উঠে এসেছে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও প্রস্তাবাবলীর মধ্য দিয়ে। উঠে এসেছে গত ২২ মাসে রাজ্যের নতুন সরকারের নেয়া কর্মচারী স্বার্থবিরোধী বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা। পেনশনের অধিকার আজ রাজ্যে আক্রান্ত। বন্ধ হয়ে গেছে গ্রুপ-সি কর্মচারীদের মেডিক্যাল রিইম্বার্সমেন্ট। সমস্ত কর্মচারীদের ষাট বছর পর্যন্ত চাকুরি এমনকি ডাই ইন হারনেসের অধিকার পর্যন্ত আজ আক্রান্ত। নতুন করে লাগু করা হয়েছে এসমা।

সাধারণ সম্পাদক অসীম পালের উত্থাপিত সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর মোট ৩৩ জন প্রতিনিধি তাদের আলোচনায় অংশ নেন। সম্মেলন শেষে মহুয়া রায়কে চেয়ারপার্সন, স্বপন বলকে সাধারণ সম্পাদক ও রাজেশ রুদ্র পালকে কোষাধ্যক্ষ করে ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এইচ বি রোড)-র ৪৮ সদস্যের রাজ্য কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। দু'দিনব্যাপী সম্মেলন পরিচালনা করে চেয়ারপার্সন সুভাষ রাহা সহ সভাপতিমণ্ডলী। □

জয়ন্ত দত্ত মজুমদার

মহম্মদ সেলিমের ভাষণ

▶▶ পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

পরে এটা নিয়ে গবেষণা করতে হবে। জে এন ইউ-র ছাত্রছাত্রীরা বলছে হস্টেলের ফি বাড়ানো যাবে না, স্টাইপেন্ড-স্কলারশিপের টাকা ঠিক সময়ে পেমেন্ট করতে হবে, রেট বাড়াতে হবে। আসন সংখ্যা বাড়াতে হবে, শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। public funded education system-কে ভেঙে দেওয়া চলবে না। আমরা বেশিরভাগ লোক শিক্ষিত হতে পেরেছি কারণ সরকারী ব্যবস্থাপনায় public funded কলেজ-ইউনিভার্সিটি ছিল। আজকে দক্ষিণপন্থার উত্থান মানে জিও হবে, অ্যামিটি হবে কিন্তু সরকারী কলেজ-ইউনিভার্সিটি শেষ করে দেওয়া হবে। ছাত্ররা যখন বিক্ষোভ দেখাচ্ছে তখন বলছে এরা 'টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং'। এভাবে তাদের demonize করছে। দেশের সব নেতা একসঙ্গে বলতে শুরু করল, টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং---ওরা নাকি দেশটাকে ভেঙে দেবে! ভিডিওতে মক্ করে, হোয়াটসঅ্যাপ করে বলছে। শত্রু বানাচ্ছে ছাত্রদের। আমাদের এত র‍্যাফায়েল বিমান, এত মিসাইল, এত সেনা, ২৬ জানুয়ারি এত প্যারেড হয়, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটা ছাত্র আমাদের দেশকে ভেঙে দেবে! মানসিক জগতে এভাবে আক্রমণ করা হয়। social media, mainstream media, আই টি সেল, রিপাবলিক-টাইমস নাউ-এর মতো হাজারো চ্যানেল দিয়ে একটা ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করে দেয়। এটাকে stigmatize বলে। এটা করতে হয় খুব পরিকল্পিতভাবে। এভাবে xenophobia করা হয়। নিও ফ্যাসিস্টরা ইউরোপে করেছে। বামফ্রন্টের আমলে বামপন্থী কর্মীদের জঙ্গলমহলে খুন করার সময়ে বলেনি---হার্মাদ? এইভাবে নিত্যনতুন নাম দিতে হয়, ব্রান্ডিং করতে হয়। যেমন, একদিকে 'মোদী ব্র্যান্ড' 'মমতা ব্র্যান্ড'-কে promote করা হয়। সেইরকম আরেকটা ব্র্যান্ডে stigmatize করা হয়—'এটা খুব খারাপ' 'সাংঘাতিক' ইত্যাদি বলে। If you want to kill a dog give it a bad name। একটা কুকুরকে এমনি মারলে পশুপ্রেমী বলবে কেন মেরেছ? যদি বলা হয়. 'পাগল কুকুর', বলবে যাক, ওটাকে মেরে দিয়েছে বেঁচে গেছি, না হলে আমার বাচ্চাটাকে কোনদিন কামড়ে দিত। এভাবে মানুষকে নিরাপত্তাহীনতায় নিয়ে যাওয়া হয়, ভয়ের শিকার করা হয়, branding করে stigmatize করা হয়। আর তারপর? আক্রমণ করা হয়। তখন মনে হয় ঠিক করেছে, যা করেছে এটা ভালো। আমাদের সেনা অধ্যক্ষ বলছেন, যাঁরা আন্দোলন করছেন তাঁদের নেতৃত্ব খুব খারাপ। অথচ সংবিধানের ২১ নম্বর ধারায় আছে ইউনিফর্ম পরিহিত কোনো সেনা অফিসার রাজনৈতিক বিষয়ে মন্তব্য করতে পারেন না। আবার সরকারী কর্মচারীরা যখন আন্দোলন strike করে তখন ধারা দেখায়! এভাবে নিজের বেলায় আনো খাই, পরের বেলায় আল্লার দোহাই চলতে পারে না।

পুলিশ ঘরে ঢুকে ঢুকে মারছে। 'shoot at sight' ঘোষণা না করেও খুন করা হচ্ছে। সেনা দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে, কিন্তু defiance-এর যে mood আছে তাতে মিছিল-মিটিং কি কমছে? বহুবিধ আক্রমণ---এটা শুধু নাগরিকত্ব আইনের আক্রমণ না। এটা একটা গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো হয়েছে।

৫০ বছরের মধ্যে এত বেকারত্ব ছিল না, সরকার বলছে। নির্বাচনের আগে সমস্ত statisticsকে ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। ভোটের পর বলতে আরম্ভ করেছে, অর্থনৈতিক সংকট আছে। তাহলে এটা কি হঠাৎ করে এল? একে বলে মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট। স্ট্যাটিস্টিক্যাল অর্গানাইজেশনের পরিসংখ্যান ছিল। আমি নিজে পার্লামেন্টের estimate কমিটির সদস্য ছিলাম, মুরলী মনোহর যোশী ছিলেন চেয়ারম্যান। বিনিয়োগ নিয়ে, নন-পারফর্মিং অ্যাসেটস্ নিয়ে, বেকারী নিয়ে, জি ডি পি নিয়ে চারটে রিপোর্ট চার বছর ধরে খেটে খেটে আমরা তৈরী করেছিলাম। একটা রিপোর্টও পার্লামেন্টে রাখতে দেয়নি। পরিসংখ্যানের ব্যাপারে গোটা বিশ্বের কাছে আমাদের দেশের একটা গরিমা ছিল, মর্যাদা ছিল। আই এস আই কলকাতা এমনি এমনি হয়নি। সাংখ্যায়িক বিজ্ঞানীরা, সংখ্যাতত্ত্ববিদরা আমাদের এই সম্মানের জায়গায় নিয়ে গেছেন। (এরমধ্যে) বাংলার একটা বড় ভূমিকা ছিল। আমরা যে data বলি সেটা credible। মোদী সরকারের ৫ বছরে গোটা বিশ্ব জেনে গিয়েছে আমাদের দেশের সরকার যে তথ্যগুলো দিচ্ছে তা জল মেশানো, credibility নষ্ট হয়ে গেছে। ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিকাল কমিশনের ৭জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন পদত্যাগ করেছেন ভোটের আগে। কারণ তারা যা পরিসংখ্যান বার করছেন তা পেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। শ্রম সম্পর্কিত রিপোর্ট পার্লামেন্টে রাখতে দেওয়া হয়নি তিন বছর।

৮ জানুয়ারির দাবিগুলি নিয়ে আলাদা আলাদা ক্ষেত্রের বহু সংখ্যক মানুষ যুক্ত হবেন। বামপন্থীদের কাজ সবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাবিকে সূত্র বদ্ধ করা এবং অর্থনৈতিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সংকট, ব্যবস্থার সংকটের সঙ্গে সেগুলি link করা। ৯০ দশকের গোড়ায় অর্থনৈতিক সংস্কারের নামে, লিবারালাইজেশন - প্রাইভেটাইজেশন - গ্লোবালাইজেশনের নাম করে structural adjustment করা হচ্ছে বলা হতো—অর্থনীতির ক্ষেত্রে। আর এখন কী হচ্ছে? এখন একটা from of structural adjustment হচ্ছে, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। অর্থনীতির পথ ধরে যে দক্ষিণপন্থার দিকে ভারত ঢুকেছে, রাজনীতি, প্রতিষ্ঠানগুলোকে এবং এখন গোটা দেশটাকে ঐদিকে ঢোকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তাতে সাধারণ মানুষের বিপদ বাড়ছে, কিন্তু যখন দেওয়া হচ্ছে মোড়কটা ধর্মীয় রাখা হয়েছে। কোথাও ভাষার নামে, কোথাও জাতির নামে, কোথাও ধর্মের নামে এইভাবে তাকে palatable করা হচ্ছে। presentable করা হচ্ছে। এইজন্য আমরা প্রথম থেকে বলেছিলাম, ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি (যোগ করা যাবে না।) ধর্ম ধর্মের জায়গায় থাক, তার পবিত্রতা পবিত্রতার জায়গায় থাক। মানুষের শাস্ত্রাচার -দেশাচার-লোকাচার আছে, কিন্তু রাজনৈতিক মঞ্চে ধর্মকে ব্যবহার করা হলে একটা বিস্ফোরক পরিস্থিতি তৈরী করা হয়, ইতিহাসে সব দেশে এর উদাহরণ আছে। রবীন্দ্রনাথ এজন্যই বলেছিলেন, 'ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে/ অন্ধ সেজন মারে আর শুধু মরে।' ধর্ম থেকে ধর্মের মোহ তৈরী করা হল। Soft religionকে hard religion করা হয়েছে। আফগানিস্তানে যখন গণপ্রজাতন্ত্রী নাজিবুল্লা সরকার, তখন ধর্মকে ব্যবহার করে প্রথমে মুজাহিদিন, তারপরে তালিবান। তারপরে আই এস। এক একটা লেভেল পার হয়। বামিয়ানের বৌদ্ধমূর্তি ছিল গান্ধার শিল্পের নিদর্শন হিসাবে। আর ইসলামও বারো'শ বছর ধরে আফগানিস্তানে ছিল। কোনো বিরোধ হয়নি। যে মুহূর্তে Soft ইসলাম থেকে hard ইসলাম করা হলো, তেহরান, পাকিস্তান, লন্ডন, প্যারিস, ওয়াশিংটন সব এককাট্টা হলো, ডলার পাউন্ড স্টারলিং সব দিয়ে militarize করা হলো--- লালকে আটকাতে হবে। তখন বামিয়ানের বৌদ্ধ মূর্তিটাকে কামানের গোলা লাগিয়ে ভেঙে দেওয়া হলো। কী হলো? গোলামির নিদর্শন নাকি শেষ করে দেওয়া হলো! আফগানিস্থানে কি গোলমির নিদর্শন শেষ হল? সমস্যা আরও বাড়ল। আজও আফগানিস্তান মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পায়ের তলায়। ধর্মকে এইভাবে ব্যবহার করা হয়। Symbolismটা কাজ করে, মানুষের ধারণাটা আবেগ বিশ্বাসের থেকে হয়। আমাদের রাজ্যে, দেশের স্বাধীনতার আগে বা পরে যখন ধর্মের নাম করে হিংসা হয়েছে দেশ ভাগ হয়েছে, তখনও রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে মেলানো হয়নি। শুধু বামপন্থীরা নয়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুও মেলাননি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও মেলাননি। আর বামপন্থীদের তো স্পষ্ট ধারা আছে। মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে বসলে পীরজাদা, শাহজাদা, ইমাম, টিপু সুলতানের ইমাম, শাহী ইমাম সব ঘিরে থাকে। এমনিতে সব পাড়ায় ইমাম থাকে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বসে গেলে শাহী ইমাম! বাঙালিদের একটু আদিখ্যেতা আছে। মোগলাই, শাহী বললে কদরটা একটু বেড়ে যায়। এই নাগরিকত্ব আইনের সময় জামা মসজিদের ইমাম আহমদ বুখারি অমিত শাহ যা বলেছেন সে কথাই বলেছেন। একজন জিজ্ঞাসা করল, শাহী ইমাম বলছেন, তাহলে আপনারা কেন বিরোধিতা করছেন? আমি বললাম, শাহী ইমামের জন্য করছি নাকি? আমাদের রাজনৈতিকবোধ থেকে করছি। আমাদের সংবিধান সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা থেকে বলছি। যদি তুমি মানুষ হও, তাহলে জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।

দিল্লীতে এলাহাবাদে আমরা দেখিনি ধর্ম-সংসদ সাধুসন্তদের নিয়ে? এমনিতে সাধুরা খারাপ লোক না। কিন্তু ওদের দিয়ে promote করা হয়। কেন করা হয়? আপনাদের সরকারী দপ্তরে কেউ যদি অরিজিনাল মার্কিশিট নিয়ে আসে সেটায় attested করাতে লাগে? যদি নকল বা জেরক্স হয় তখন স্ট্যাম্প দিয়ে attest করাতে লাগে। মুখ্যমন্ত্রী হোন বা প্রধানমন্ত্রী যদি সত্যি কথা বলেন attest করার জন্য ধর্মীয় গুরু লাগে না, যদি মিথ্যা কথা বলেন তখন ধর্মীয় গুরু রাখতে হয়। এভাবে ধর্মকে মিক্স করা হয় রাজনীতির সঙ্গে, নিজেদের স্বার্থে, ধর্মের স্বার্থে নয়।

যোগীর সিলেবাস আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর সিলেবাস আলাদা না। আর এজন্য কর্মচারী, শিক্ষক, ছাত্র, বেকাররা যখন আন্দোলন করে লাঠি গুলি পুলিশ দিয়ে শায়েস্তা করে। আপনাদের করেনি? আপনাদের বদলির কথা তো বিখ্যাত হয়ে গেছে। ট্রেনে আসার সময়ে ডেন্টাল কলেজের এক ডাক্তার ছবি তুলতে চাইলেন। বললাম, ফেসবুকে পোস্ট কোরো না। বলা যায় না। হয় তো কোচবিহারে ট্রান্সফার হয়ে গেলে! বলেছিলেন না মুখে লিউকোপ্লাস্ট লাগিয়ে রাখো? মিছিল করা যাবে না, মিটিং করা যাবে না, ঝান্ডা তোলা যাবে না, শহীদ বেদী রাখা যাবে না? একটা ছাত্রসংসদ ছাত্ররা পরিচালনা করতে পারবে না? স্কুল কমিটি, মাদ্রাসা কমিটি, লাইব্রেরি কমিটি, ক্লাব কমিটি থাকবে না? গণতন্ত্রের গলা টিপেছেন। গণতন্ত্রকে কবর দিয়ে এখন তার ওপর ধর্মনিরপেক্ষতার নামে যদি চেরাগ জ্বালান, সে চেরাগ কখনও জ্বলতে পারে না। আর গোটা দেশে বিজেপি ধর্মনিরপেক্ষতাকে চিতায় তুলে এখন বলছে আমাদের রাজ্যে এসে গণতন্ত্র উদ্ধার করবে। কখনও সম্ভব? আমি যেমন দুপায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের দেশের সংবিধানও দুটো পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে - ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র। যদি এ দেশ গণতান্ত্রিক না হয় তাহলে ধর্মনিরপেক্ষতা থাকবে না। আর যদি ধর্মনিরপেক্ষ না থাকে তাহলে গণতান্ত্রিক হবে না। আফগানিস্তান, পাকিস্তান ইত্যাদি আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলো ধর্মনিরপেক্ষ নয় বলেই সেখানে গণতন্ত্র দানা বেঁধে ওঠে নি। মাঝে মাঝেই মিলিটারি শাসনের আওয়াজ শোনা যায়। আমাদের দেশের রাজনীতিতে মিলিটারির আওয়াজ এত সহজে শোনা যেত না। কিন্তু নাগরিককে যখন একটা ভয়ের বাতাবরণে ঢোকানো হয় তখন militarized state করা হয়। authority কে শক্তিশালী করা হয়। আর তখন গণতান্ত্রিক অধিকার, মানবাধিকার এসব কেড়ে নেওয়া হয়।

মানবাধিকার যখন কাড়া হয়, মানবাধিকার না বলে ধর্মের নামে করলে বলা হয়---তোমরা ঠিক থাকবে, এখন শুধু সংখ্যালঘুদের অধিকার কাড়ছি। এগুলো Universal values। সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বাংলাদেশে, পাকিস্তানে, আফগানিস্তানে হলে খারাপ, তাহলে সংখ্যালঘুদের নির্যাতন আমাদের দেশে হওয়াও তো খারাপ? এজন্য আমাদের যখন বলে কিউবাতে কী হচ্ছে, প্যালেস্টাইনে কী হচ্ছে, ভিয়েতনামে কী হচ্ছে সেসব নিয়ে তোমরা কেন (আন্দোলন) করছ, তখন বলি---এগুলো Universal values। মুক্তিকামী মানুষ পৃথিবীর যেখানেই স্বাধীনতার অদম্য ইচ্ছাকে, মুক্তচিন্তাকে দমানো হবে, তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলবে। মানবাধিকারের পক্ষে যে লড়ছে সে রং দেখে নয়, ঢং দেখে নয়, মানবাধিকার যেখানে হরণ হবে সেখানেই সোচ্চার হবে। ট্রেড ইউনিয়ন যে করছে তার ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার যদি কাড়া হয় তখন রঙ দেখা যাবে না। কালেকটিভ বার্গেনিং-এর হক আছে, নিজের হক কথা সোচ্চারে বলার অধিকার আছে---সেটা যখন কাড়া হবে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হবে। আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, Co-ordinate করা, সূত্রবদ্ধ করা। এটা কঠিন, কারণ আমাদের আলাদা আলাদা ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে, খুচরো করে দেওয়া হচ্ছে। আজকে আমাদের দেশের সরকার পাইকারী হারে সব অধিকারগুলো কাড়তে চাইছে। তার আগে আমাদের রাজ্য সরকার খুচরো ব্যবসার ধরনে একই কাজ করেছেন---পাড়ায়, মহল্লায়, গ্রামে , পঞ্চায়েতে, পৌরসভায়, সরকারী অফিসে, স্কুলে-কলেজে সেই অধিকারগুলো কেড়েছেন! দুটো আলাদা না, এটা বুঝতে হবে। এমনভাবে পেশ করা হচ্ছে কর্মচারী মহলে, ছাত্রদের মহলে, শিক্ষিত মহলে, বুদ্ধিজীবী মহলে যে এটার এত দাপট, এত খারাপ, এত বিপদ, একে মোকাবিলা আর কে করবে?---আগে রাম পরে বাম। এগুলো coinage করা হয়। যেরকম 'বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী' একটা কয়েনেজ, 'হার্মাদ' একটা কয়েনেজ। এগুলোর জন্য কোটি কোটি টাকা খরচা করা হয়।

আজকে বলছে, তৃণমূল খারাপ, যখন সিঙ্গুরে তিনি অবস্থান করছিলেন তখন রাজনাথ সিং পৌঁছে গিয়েছিলেন, নন্দীগ্রামের সময় বর্ধমানের এখনকার এম পি গিয়েছিলেন, সুষমা স্বরাজ, আদবানীও গেছিলেন। তখন ছিল 'লাল হঠাও দেশ বাঁচাও'। লাল হঠল, কিন্তু দেশ বাঁচল না । আসলে দেশটাকে বাঁচাতে গেলে লালটাকে রেখে করতে হবে, লালটাকে বাড়িয়েই করতে হবে।

তৃণমূল এত খারাপ---দুর্নীতি, কাটমানি, চুরি, জোচ্চুরি, ধর্ষণ, লুঠ, হামলা, মিথ্যা মামলা, দলবদল, কেনা বেচা---তো কে তাকে তাড়াবে? না কাঁটা সে কাঁটা নিকলেগা। ছিল একটা কাঁটা হল দুটো কাঁটা। কিন্তু দুটো আলাদা কাঁটা কি? নাম করে করে বলা যায় সারা রাজ্যে তারা একই লোক। যেন এমন একটা ওয়াশিং মেশিন---এদিক থেকে চিটফান্ডের এক চোরকে ঢোকানো হোলো ওপাশ থেকে সে সাধু হয়ে বেরলো! বলছে, দস্যু রত্নাকরও বাল্মিকী হয়েছিল। তৃণমূল চোর-ডাকাত এককাট্টা করেছিল। তারা এখন পাল্টে যাবে! আসলে একই গুদামের মাল, শুধু শো-রুম পাল্টেছে। এটা হাসির ব্যাপার না।

আমাদের দেশের সেকুলার ডেমোক্র্যাসিকে ভেঙে ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরী করে একটা ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র করার জন্য যেভাবে বিশ্বপুঁজি এবং আমাদের দেশের একচেটিয়া পুঁজি আমাদের অর্থনীতিকে, আমাদের ব্যাঙ্ককে, অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে, সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে নিজেদের হাতের মুঠোয় নিতে চায় এবং সেটা নেওয়ার জন্য ধর্মকে আবরণ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বেশিরভাগ মানুষের ধর্মবিশ্বাস আছে। তাকে এভাবে আকর্ষণীয় প্যাকেজের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদীকে সঙ্ঘপরিবার পশ্চিম উপকূলে গুজরাটে মুখ্যমন্ত্রী করে এই এক্সপেরিমেন্টটা করেছিল যে, কীভাবে আমাদের দেশের ধর্ম নিরপেক্ষ মনকে বিষিয়ে দিয়ে ঘৃণার আবর্তে ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরী করা যায়। তারপর হিন্দু হৃদয় সম্রাটের স্লোগান হবে—'যো হিন্দুহিতকা বাত করে গা হিন্দুস্থানমে রাজ করে গা'!

তৃণমূল কংগ্রেসের সম্রাজ্ঞীকেও আবিষ্কার করেছিল তারা। তাকে cultivate করা হয়, রসদ দেওয়া হয়। গত ২০ বছরের ইতিহাস, বা তারও আগে যখন তিনি যুব কংগ্রেসের নেতা। ৮৫-র পর থেকে তাকে ধাপে ধাপে cultivate করা হয়েছে এবং গণতন্ত্র কীভাবে শেষ করা যায় তার experimentটা পূর্ব উপকূলে পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে।

আপনারা ৭০ দশকের আক্রমণের কথা বলছেন। এখানে কম. অজয় মুখোপাধ্যায়, কম. সুকোমল সেনের স্মরণে কম. অজয় মুখোপাধ্যায় নগর, কম. সুকোমল সেন মঞ্চ করেছেন আপনারা। তাঁদের সময়কালে সাথী যাঁরা ছিলেন, তাঁরা জানেন, যাঁরা পেনশনার্স এসোসিয়েশনের মধ্যে আছেন তারা বলবেন, অনেকে দীর্ঘদিন এই আন্দোলনের ধারার মধ্যে থেকে জানেন---সে সময়ে repression কম হয়েছে? গোটা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার আগে আমাদের রাজ্যে অঘোষিত জরুরী অবস্থা জারি করা হয়েছে। আমাদের প্রজন্মের রাজনীতিকরণ হয়েছে ঐ গণতান্ত্রিক অধিকারের লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে এবং আমরা রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছি। Democratic Rights-কে curtail করা হয়েছে। কার জন্য? বলা হয়েছে, দেশের স্বার্থে। কিন্তু আদতে নিজের গদির জন্য। দেশের মানুষ মেনে নেয় নি। এখানে বিশ্বাসের জায়গা রাখতে হবে। সরকার পাল্টায় একটা ভোটে, regime পাল্টায় একটা বড় বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে। অথচ আমাদের রাজ্যে যখন ২০১১-তে তৃণমূল কংগ্রেস জিতল, সমস্ত খবরের কাগজ দেশী এবং বিদেশী—ওয়াশিংটন পোস্ট এবং নিউইয়র্ক টাইমস্ও বলল যে, বাংলায় regime change হয়েছে, জমানা পাল্টে গেছে। ভোটে তো হার-জিৎ আছে। বলেছিলেন, মুখে লিউকোপ্লাস্ট লাগিয়ে রাখো! মিছিল-মিটিং-করতে পারবে না। কারণ তার ব্রিফটা ছিল---বামদের নিকেশ করতে হবে। তা না হলে, এত বদলার ভাব থাকে না। অথচ স্লোগান কী দিয়েছিলেন? 'বদলা নয়, বদল চাই।' বদল কিছুই করেন নি, সবটাই বদলা করেছেন। এই প্যাকেজিংটা খুব well thought of। তাহলে আজকে আমাদের রাজ্যে বি জে পি এলে সব বদল করে তৃণমূলকে শায়েস্তা করে দেবে এমনটা মনে করার কোনো কারণ আছে কি? দুটো উদাহরণ। ত্রিপুরা দেখছেন না? তৃণমূলকে তাড়ানোর জন্য কি বি জে পি তৈরী হয়েছে ওখানে? তৃণমূলটা তৈরী হয়েছিল কীসের জন্য? আসামে যেদিন এন আর সি-র ড্রাফ্ট লিস্ট বেরিয়েছে গোটা lock stock and barrel রাজ্য কমিটি, রাজ্যকমিটির অফিস, লোকজন-এম এল এ-মন্ত্রী সব চলে গেল তৃণমূল থেকে বিজেপিতে। ইউ ইম আই, মুসলিম লিগ যেমন চলে গিয়েছে। এরা আসলে খেলোয়াড় না, এরা পুতুল। কাঠপুতুলকে যেমন সুতো টেনে টেনে একবার একটা ডাকাতকে ঘোড়ার ওপর বসিয়ে দিচ্ছে, তারপর একটা রাজপুত্রকেও বসিয়ে দিচ্ছে, তারপর দরকারে side-এ নিয়ে গিয়ে রেখে দেয়। আবার একটাকে জুড়ে দেয়! তাহলে নীতি থাকবে না, আদর্শ থাকবে না, কর্মসূচী থাকবে না, লক্ষ্য থাকবে না?

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ভাঙা হয়েছে, গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ভাঙা হয়েছে। আর ফ্যাসিবাদের উত্থানের আগে গণতান্ত্রিক অধিকারকে আগে ভঙ্গুর করে দেয় আলাদা আলাদা ভাবে করে--race নিয়ে হোক, ধর্ম নিয়ে হোক্, রাজনীতি নিয়ে হোক। instrument টা আলাদা, লক্ষ্যটা এক। সুতরাং এটার পাল্টা ওটা, ওটার পাল্টা এটা নয়। একটা বড় প্রোজেক্টের জন্য ভেঙে ভেঙে আলাদা আলাদা টেন্ডার হয়, আলাদা আলাদা কোম্পানি কাজ করে। কোনোটা সিভিলের কাজ, কোনোটা ইলেকট্রিক্যালের। কাজ করার সময় তাদের মধ্যে ছোটখাট ঝামেলা হতে পারে। যেমন তৃণমূল-বি জে পি-র হয়। কিন্তু দুটোই একই প্রোজেক্টের, একই আর্কিটেকচারের অংশ। একজন গণতন্ত্রকে শেষ করেছে, একজন ধর্মনিরপেক্ষতাকে। আর যত চূড়ার দিকে যায়, summit-এর দিকে যায় তত কাছাকাছি আসে। এটাই তামাশা!

লড়াই যদি করতে হয় তাহলে ডবল ব্যারেল গানের মতো নিশানা ঠিক রাখতে হবে। তা না হলে মনে হবে ওরা নাগরিকতা আইন করতে চেয়েছে, দিদি আটকাতে চেয়েছে। এই ধোঁকাদারিটা করতে চেয়েছে সব ব্যাপারে। এদিকে ডিটেনশন ক্যাম্পের জমিও দিচ্ছিলেন, ওদিকে নোটিশও দিচ্ছিলেন। বলেছিলেন আমাদের রাজ্যে এন পি আর হবে না। আর এদিকে সম্প্রতি ইসলামপুরের তৃণমূল পরিচালিত মিউনিসিপ্যালটি এন পি আর-এর ট্রেনিং-এর জন্য লোক চেয়ে স্কুলের হেডমাস্টারকে চিঠি দিয়েছে। এটা হচ্ছে দ্বিচারিতা। সাধারণ মানুষের কাছে একটা পর্দা লাগানো হয়েছে। সেই পর্দাটা এখন ধর্মের হওয়ায় মনে হচ্ছে হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে বিরোধ। বিষয়টা হিন্দু মুসলমানের না। বিষয়টা দেশটাকে বাঁচানোর। বিষয়টা হিন্দুর নয়। বি জে পি বোঝাতে চাইছে এটা হিন্দুর। বিষয়টা মুসলমানের নয়। মুসলিম সাম্প্রদায়িক ও তৃণমূল---এরা বোঝাতে চাইছে বিষয়টা মুসলমানের। আসলে, বিপদটা আমাদের রুজি-রুটির, আমাদের পেশার, আমাদের শিক্ষার, আমাদের স্বাস্থ্যের।

যখন এই নাগরিকতা আইন নিয়ে হৈ চৈ কেটে যাবে দেখবেন রেল বিক্রি হয়ে গেছে, এয়ারলাইন্সটা নেই! লড়াই করেই মাটিটা রাখতে হবে। দুর্গাপুর এলায়েড স্টিল প্ল্যান্ট কেন্দ্রীয় সরকার বেচতে চাইছিল আর সেখান শ্রমিক-কর্মচারীরা এককাট্টা হয়ে দিনের পর দিন লড়াই করেছে। সালেমে ব্রিজ অ্যান্ড রুফেও তাই। তৃণমূল কী করে বি জে পি-কে আটকাবে? দুর্গাপুরের রাজ্যের অধীন রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা তো তৃণমূল আগেই বেচেছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়-এর প্রতিষ্ঠিত এশিয়ার প্রথম ফার্মাসিউটিক্যাল কারখানা বেঙ্গল কেমিকেল ধুঁকছে এবং সরকার বলছে বেচে দেবে। আর বাবা রামদেবের পতঞ্জলির জিনিস বিক্রি হচ্ছে।

অতুল প্রসাদের গান ছিল 'হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর' এখন বলা হচ্ছে, ধরমেতে বীর আর করমেতে ধীর হও! তাই সবকিছু ভেঙে পড়ছে। শুধু মাঝের হাট ব্রিজ নয়, মানুষের মধ্যে সেতুও।

বামপন্থীরা পরিবর্তন বলতে বোঝে আমূল পরিবর্তন। আমরা কেউই এই ব্যবস্থার মধ্যে খুশি না। একা পারি না বলে সবাই সমবেত হই। আমরা উত্তরণ চাই—সমাজের, অর্থনীতির, ভবিষ্যত প্রজন্মের। সুকান্ত নবজাতকের প্রতি অঙ্গীকার করে বলেন,'প্রাণপণে সরাব জঞ্জাল, এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি'। এর বিপরীতে? লুঠ করো, চেটেপুটে ভোগ করো---আমাদের পরিবেশ, জলবায়ু, খনি-খাদান-জমি-জল-জঙ্গল পৃথিবীর সবকিছু সর্বনাশ কর। বামপন্থা ও দক্ষিণপন্থার লড়াই এখানেই। একজন দক্ষিণপন্থী মনে করে, আমি বাপ-ঠাকুরদার উত্তরসুরী হিসেবে সবকিছু পেয়েছি, তাই ভোগ করতে হবে, লুঠ করতে হবে। একজন বামপন্থী মনে করেন, আমি আমার ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছ থেকে এটা ধার নিয়েছি। এটা আরও সুন্দর করে, আরও সাজিয়ে, আরও মহান করে ফেরত দিতে হবে।

কাল মোদীজী ২ লাখ টাকার চশমা পড়ে সূর্যগ্রহণ দেখেছেন। ওটা দিয়ে বেকারত্বের জ্বালা দেখা যায় না। ক্ষুধার তালিকায় আমাদের দেশ এখন ১০২ নম্বরে। ১১৯টা দেশের মধ্যে। যাঁরা এটা বোঝেন তাঁরা রাস্তায় নেমেছেন।

একজন ছাত্র লড়ছেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, একজন যুব বেকারদের কাজের দাবিতে, একজন খেতমজুর-দিনমজুর লড়ছেন মজুরির জন্য মাঠে-ময়দানে, একজন কৃষক লড়ছেন ফসলের দামের জন্যে, একজন শিক্ষক তাঁর মর্যাদার জন্যে, একজন কর্মপ্রার্থী ধর্ণা দিচ্ছেন---কোর্টেও যাচ্ছে, সড়কেও যাচ্ছে, লাঠিও খাচ্ছে---টেট-এসএসসি পাশ করা বা আপার প্রাইমারী যাই হোক না কেন, একজন বন্ধ কারখানার শ্রমিক কারখানা খোলার অপেক্ষা নিয়ে লড়ছেন, চা-বাগানের শ্রমিক অনাহারের থেকে বাঁচার জন্য লড়ছেন----ব্যাপারটা আলাদা আলাদা নয়। 'মিলে সুর মেরা তুমহারা, তু বনে সুর হামারা'। সবার সুর একসঙ্গে লাগাতে হবে। এটাই এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষে এসে আমাদের পরীক্ষা। সংসদ যখন মানুষকে ন্যায় দিতে পারে না, সড়ক তখন জেগে ওঠে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য। □

অনুলিখন ঃ শাশ্বতী মজুমদার

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
48th Year, 9th Issue, January 2020

Regd. No. : 18484/71
Price : Two Rupees

ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এইচ বি রোড)-এর রাজ্য সম্মেলনে

আগামীর লড়াইকে আরও জোরদার করার আহ্বান

সম্মেলনের উদ্বোধন করছেন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য

এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আজ ত্রিপুরা চলছে। গণতন্ত্র, সভা-সমাবেশ করা, রাজনৈতিক দল বা কোনো গণসংগঠনের অফিস খোলা রাখাটাও আজ অঘোষিতভাবে নিষিদ্ধ। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ—একটি নির্বাচিত সাংবিধানিক সংস্থা, একে পর্যন্ত কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। উপজাতি এলাকায় আমরা উন্নয়ন প্রক্রিয়া জারি রেখেছি। নতুন রাস্তাঘাট, বাজার-হাট করছি। পাকা বাড়ি বানাচ্ছি কিন্তু এগুলোকে উদ্বোধন করতে দিচ্ছে না। বলছে, করতে পারবে না। গ্রামের মানুষ আজ চরম বিপর্যয়ের মধ্যে আছে। এতদিন আমরা শুনতাম অভাবের তাড়নায় রেশন কার্ড বন্ধক রাখা হয়—এখন তা প্রত্যক্ষ করছি। শুধু রেশন কার্ড নয়, রেগার জবকার্ড, বয়স্ক ভাতা পর্যন্ত বন্ধক চলছে। প্রতিদিন রাজ্যের কোনো না কোনো অংশে অভাবের তাড়নায় শিশু বিক্রি হচ্ছে। গতকালও সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখলাম তৈচাকমা গ্রামে এক মা তার সন্তান বিক্রি করে দিয়েছে মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে। ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এইচ বি রোড)-এর ত্রয়োদশ রাজ্য সম্মেলনে দাঁড়িয়ে কথাগুলি বলেন, রাজ্যে বামফ্রন্ট পরিচালিত উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা।

তিনি বলেন, কয়েক শত বছরের সামন্ত শাসন কাটিয়ে রাজ্যের এক ভিন্ন চেহারা আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। কী ছিল আমাদের রাজ্যে? রাজধানী আগরতলা শহরকে বাদ দিলে আর কোথায় কী ছিল? ১৯৭৮-এ প্রথম বামফ্রন্ট সরকার আসার পর নতুন নতুন ব্লক হলো, মহকুমা হলো, নতুন জেলা গড়ে উঠলো। স্বশাসিত জেলা পরিষদ হলো, প্রশাসনকে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হলো। উপজাতি এলাকায় গড়ে উঠলো অসংখ্য স্কুল। এগুলো কি এমনি এমনিই হয়ে গেছে? না, বহু সংখ্যক মানুষের লড়াই আন্দোলন এগুলোর চালিকাশক্তি। পরিকাঠামোগত উন্নয়ন রাজ্যের চেহারাটাকেই পাল্টে দিয়েছে। ২০১৮-র রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে বর্তমান শাসক জোট অসংখ্য মিথ্যা প্রতিশ্রুতি রাজ্যের মানুষকে দিয়েছিল। কর্মচারীদেরও বলা হয়েছিল অনেক ভালো ভালো কথা। আজ কী দেখছি আমরা? নতুন কিছু দেওয়া তো দূরের কথা, যা ছিল তাও হারাচ্ছি। গত কয়েকদিন আগে বাইজলবাড়ি থেকে একজন ছেলে এসেছে আমার কাছে, সরকারি কর্মচারী বাবা মারা যাওয়ায় ডাই ইন হারনেসে চাকুরির দাবি নিয়ে। কিন্তু দেওয়া গেলো না। কারণ মৃত্যুর তিনদিন আগে বাবার বয়স ৫০ পেরিয়ে গেছে। ত্রিপুরায় বি জে পি সরকারের নতুন নিয়ম ৫০ উত্তীর্ণ সরকারী কর্মচারীর মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারের কেউ আর সে চাকরি দাবি করতে পারবে না। তখন সে দুঃখ করে বলছে—"বাবা মারাই যখন গেল তিন দিন আগে মারা গেলে তো চাকরিটা অন্তত পেতাম।" ভাবুন মানুষ আজ কতটা অসহায়! কোন জায়গায় ওরা রাজ্যটাকে নিয়ে গেছে!

প্রধান অতিথি বিজয় শংকর সিংহ

আত্মসম্মান নিয়ে কর্মচারীরা কাজ করতে পারছেন না। খোদ মুখ্যসচিবও এর বাইরে নন। তাঁকে পর্যন্ত পদাবনতি ঘটিয়ে ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর করে দেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৪০ জনের ওপর পুলিশ অফিসার, যার মধ্যে এস পি, আই জি থেকে শুরু করে সাব ইন্সপেক্টার সবাই রয়েছেন, তারা কেউ বরখাস্ত, কেউ গ্রেপ্তার, কারোর হাজত—কিছুই বাদ যায়নি। অফিসে বসে টিফিনের সময় এক ইঞ্জিনিয়ার রাজ্যের এম পি'র ভাই সম্পর্কে নাকি কী বলেছেন। সে অভিযোগে তাকে বরখাস্ত করে দেওয়া হচ্ছে। ফেসবুকে সমাবেশের ছবি দেওয়ার কারণে অবসরগ্রহণের তিনদিন আগে সমন্বয় কমিটির একজন নেতৃত্বকে সাসপেন্ড হতে হয়েছে প্রতিহিংসার শিকার হয়ে। এই তো চলছে প্রশাসন।

সম্মেলন করাটাই যেখানে চ্যালেঞ্জ ১৯৬৮ সালের ২৫ এপ্রিল মাত্র ৬টি সংগঠনকে নিয়ে গড়ে ওঠা রাজ্যের কর্মচারীদের যৌথ এই মঞ্চের সম্মেলন সংগঠিত করাটাই ছিল এবারের মূল চ্যালেঞ্জ। যদিও ১৯৬৮ থেকে ২০২০—বিগত এই ৫০-৫২ বছরে সংগঠনের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকগুণ। যৌথমঞ্চে শামিল হওয়া শিক্ষক কর্মচারীদের সংগঠনের সংখ্যা আজ ৬ থেকে বেড়ে ১২। বেড়েছে সদস্যপদ। প্রতিটি মহকুমায় হয়েছে শক্তিশালী বিভাগীয় কমিটি (ত্রিপুরায় সাংগঠনিক পরিকাঠামোতে রাজ্য কমিটির পরই বিভাগীয় কমিটি, এখানে জেলা কমিটি নেই)। তাই, এই সংগঠিত শক্তি আজ আধা ফ্যাসিবাদের ভয়ের কারণ। অঘোষিত ফতোয়া ছিল কোথাও সম্মেলন করা যাবে না। ছুটির পর স্কুল অফিস চত্বরে তো নয়ই, কোথাও কোথাও সংগঠন কার্যালয়েও করা সম্ভব হয়নি সম্মেলন। তাই মাত্র দশ হাজার চারশো উনিশ বর্গ কিলোমিটারের এই রাজ্যে শুধুমাত্র বিভাগীয় সম্মেলন করার জন্য শিক্ষক কর্মচারীদের ছুটে আসতে হয়েছে প্রায় শত কিলোমিটার দূরের আগরতলার সমন্বয় ভবনে। কমলপুর, জিরানীয়া, বিশালগড়, জম্পুইজলা সহ বেশ কিছু বিভাগীয় সম্মেলন করতে হয়েছে আগরতলায় উঠে এসে। ধর্মনগর বিভাগের সম্মেলন হয়েছে মূল শহর থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে আগরগাছে ঘেরা নির্জন জনবসতির এক কমরেডের বাড়িতে। সম্মেলনের প্রধান বক্তা দেবাশিষ ব্যানার্জি যখন বক্তৃতা করছিলেন তখনও খবর আসছিল রাস্তায় ওরা সংগঠিত হচ্ছে, ফেরার পথে আক্রমণ হানতে পারে। না, তবু সম্মেলন শেষ হয়েছে।

প্রতিনিধিদের টানটান চেতনাবোধ সূর্য ডোবার আগেই সম্মেলন শেষ করেছে। শুধু ধর্মনগরই না, রাজ্যের ২৩টি মহকুমার সবকটার সফল সম্মেলন শেষে গত ৮-৯ ফেব্রুয়ারি আগরতলা টাউন হলে গোটা রাজ্যের ৬৯৩ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি শামিল হয়েছিলেন তাদের লড়াকু সংগঠন ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এইচ বি রোড)-র ত্রয়োদশতম ত্রিবার্ষিক সম্মেলন মঞ্চে। সম্মেলন মঞ্চের নামকরণ করা হয় কমরেড বাদল শর্মা ও হারাধন বৈদ্য মঞ্চ।

আক্রান্ত সময়—
চলো গড়ি প্রতিরোধ

"সৈনিক পড়ো যুদ্ধবেশ হাঁকিছে স্বদেশ সামনে আবার পলাশী"—শিল্পীদের এই উদাত্ত আহ্বানে শুরু হয় ত্রয়োদশ রাজ্য সম্মেলনের প্রতিনিধি পর্ব। সেই সুরেই গোটা সম্মেলনের তার বেঁধে রাখেন সম্মেলনের উদ্বোধক প্রখ্যাত আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রধান বক্তা— সর্বভারতীয় কর্মচারী নেতা তথা এ আই এস জি ই এফ-এর চেয়ারম্যান সুভাষ লাম্বা, বিশেষ বক্তা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ সহ সমস্ত অতিথি বক্তারা।

ত্রয়োদশ রাজ্য সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রখ্যাত আইনজীবী ও রাজ্যের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, মুক্ত চিন্তার জগৎটা আজ আমাদের দেশে ভীষণভাবে আক্রান্ত। মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। ৭০ বছরের প্রজাতন্ত্র আমাদের এখনও ভয়মুক্ত পরিবেশ দিতে পারেনি। তার কিছুটা ব্যর্থতা হয়তো আমাদেরও। আমরাই সেই পরিস্থিতি গড়ে তুলতে পারিনি। এটা দুঃখের হলেও আজ সত্যি, প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ৭০ বছর পর আমাদের এখন নতুন করে শুনতে হচ্ছে—হাঁস অক্সিজেন ছাড়ে, গোমূত্রে আরোগ্য লাভ হয়। তিনি বলেন, স্বৈরাচার কখনও মুক্ত চিন্তা-গণতান্ত্রিক অধিকারবোধ মানে না। সব সময় একটা ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে রাখতে চায়। শ্রমিক-কর্মচারীদের সুরক্ষার তারা সব সময়েই বিরোধী। তাই সংগঠন যত শক্তিশালী হবে ভয়ের বিরুদ্ধে লড়াইও তত জোরদার হবে। সংগঠিত হওয়া নয় এককভাবে চলার চিন্তাভাবনা আজ আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা

▶▶ ষষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে

নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর সদস্যবৃন্দ

সুমিত ভট্টাচার্য

মানস কুমার বড়ুয়া

প্রণব কর

জয়দেব হাজরা

দেবলা মুখার্জী

সুমন কান্তি নাগ

প্রশান্ত চন্দ

সুতপা হাজরা

শাশ্বতী মজুমদার

রবীন্দ্রনাথ সিংহরায়

অতনু মিত্র

সোমনাথ পোদ্দার

বাণীপ্রসাদ ব্যানার্জী

দেবাশিস মিত্র

অসিত কুমার ভট্টাচার্য

তাপস চক্রবর্তী

অমিত ব্যানার্জী

জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অন্তর্ভুক্ত সমিতির রাজ্য সম্মেলনের রিপোর্ট আগামী ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

—পত্রিকা সম্পাদকমন্ডলী

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া

যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮

ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com

ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।